পাহাড়ের সমীকরণে কোনও ছোটখাটো ভুল ধরা পড়ল ?

চা-শিল্পে সুদিন আনতে চাই কেন্দ্র সরকারের উদাসীনতা ঝেড়ে র‍্যাপিড অ্যাকশন

অভাব দক্ষ প্রশিক্ষকের, আরসেটি ট্রেনিং নিম্নমেধার শ্রমিককে কতদূর টানতে পারে ?

১১৯ বছর ধরে ম্যাচ খেলছে জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব

এখন ডুয়ার্স

১৬-৩০ জুন ২০১৭। ১২ টাকা

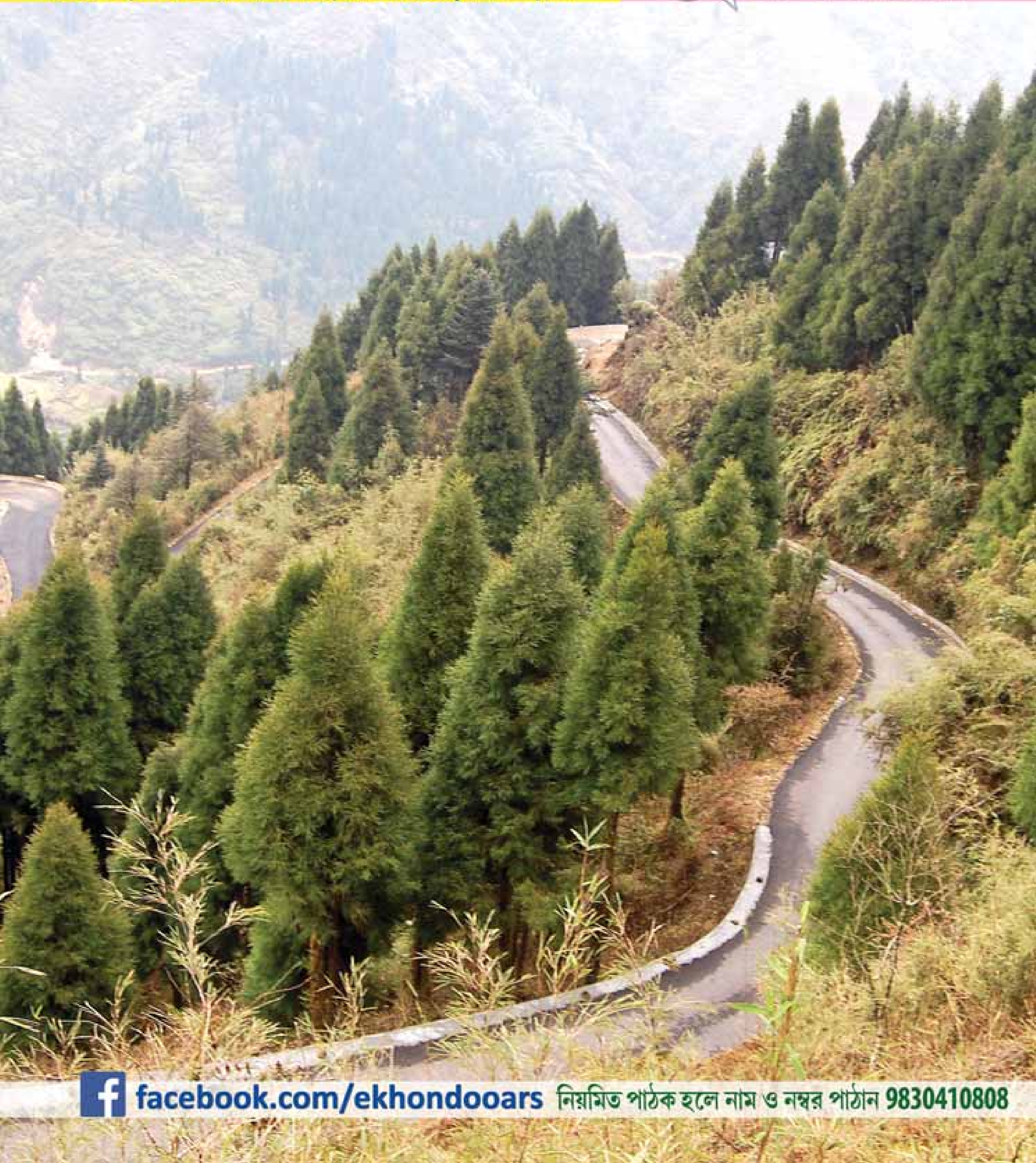

facebook.com/ekhondooars নিয়মিত পাঠক হলে নাম ও নম্বর পাঠান 9830410808

অত্যাধুনিক জীবনযাত্রা আমাদের জীবনকে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যময় করে দিয়েছে, কিন্তু তার সাথে অনেক অসুখও এনে দিয়েছে।
তার মধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্য অন্যতম.................

কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াতে ৪ টি টিপস্ ঃ-

১. প্রচুর জল খান, প্রতিদিন অন্তত ৩ লিটার।
২. দৈনন্দিন খাবারে ফাইবারযুক্ত খাবারের মাত্রা বাড়ান।
৩. মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন।
৪. রোজ অন্তত ৩০ মিনিট শরীর চর্চা করুন।

Issued for the public interest by **Pharmakraft**

From the makers of :

PICOME Susp.

কফি হাউস ? ক্লাবঘর ?
নাকি আরও অনেক কিছু ?

চা-টা। আড্ডা। দাবা-ক্যারম-টেবিল টেনিস। পার্টি। গেট টুগেদার।
সেমিনার। বেড়াতে যাওয়ার বইপত্র ও বুকিং।

সোম-শুক্র বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা। শনি-রবি বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা
ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭
পরিচালনায় NEST SOCIETY (Regn. No. S/2L/5822 of 2013-14)

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১
ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যে কেউ যোগ দিতে পারেন।

এককালীন সদস্য নেওয়া হচ্ছে

এখন ডুয়ার্স প্রকাশিত বই

পর্যটনের বই

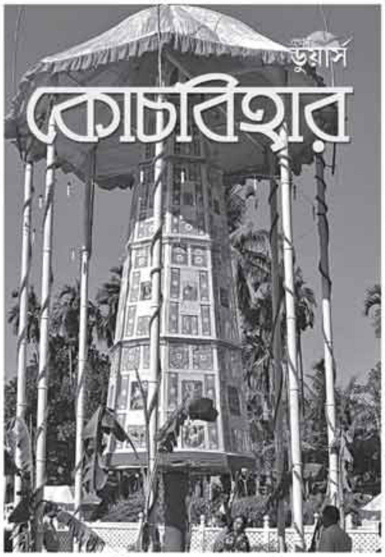

কোচবিহার। মূল্য ২০০ টাকা

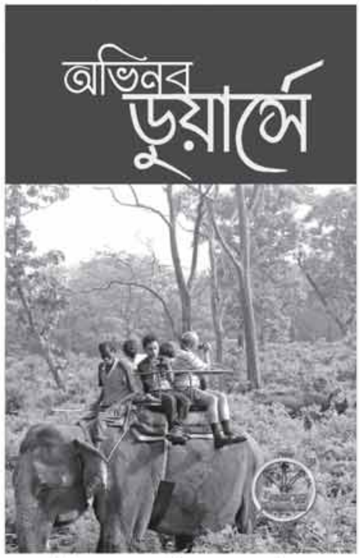

অভিনব ডুয়ার্সে। মূল্য ২০০ টাকা

চা-শিল্পের বই

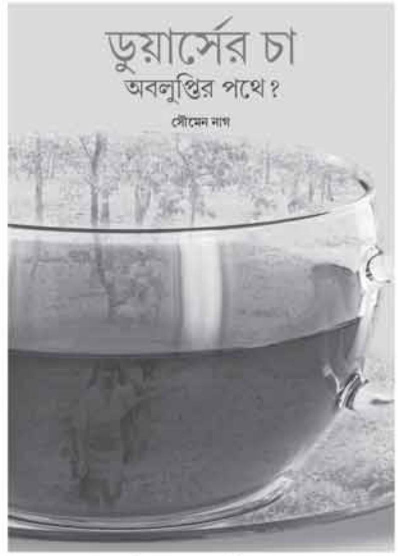

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। মূল্য ১৫০ টাকা

সাহিত্যের বই

বসন্তপথ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর উপন্যাস
মূল্য ১০০ টাকা

চারপাশের গল্প
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সংকলন
মূল্য ১০০ টাকা

লাল ডায়েরি।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর গল্প সংকলন
মূল্য ১৫০ টাকা

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা
মূল্য ৫০০ টাকা

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা

সবক'টি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান

আড্ডাঘর।
মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড,
জলপাইগুড়ি

ডুয়ার্সই তাহলে শেষ ভরসা মানছেন তো কত্তা !

সম্পাদকের ডুয়ার্স

সব তীর্থ একবার! ডুয়ার্স কিন্তু বারবার!!

এহেন একটি ফাজিল 'পোস্টার' বেশ কয়েক বছর আগে কলকাতার কোনও এক পর্যটন মেলায় চোখে পড়েছিল এবং বলাই বাহুল্য চিত্তে কিঞ্চিৎ সুড়সুড়ি লেগেছিল। সত্যি কথাটি হল, ডুয়ার্সে কোনও দিন আসা হয়নি এমন বঙ্গসন্তান যেমন এখনও কম নেই, তেমনই বছরে তিন-চারবার নানা অছিলায় ডুয়ার্স ছুঁয়ে যাওয়া প্রেমিকও বহু আছেন। এই দুই গোষ্ঠীকে বাদ দিলে ডুয়ার্সকে দ্বিতীয় শ্রেণির পর্যটনকেন্দ্র বলে অনেক আখ্যা শোনা যায়। কারণ সেখানে নাকি চাইলেই যে কেউ ধানি জমি কিনে আইনকে কলা দেখিয়ে কটেজ-রিসর্ট বানিয়ে ফেলতে পারে! সেখানে নাকি কোনও শিক্ষিত গাইড বলতে যা বোঝায় তা পাওয়া যায় না! সেখানে এটিএম কদাচিৎ মিললেও নাকি টাকা মিলবেই, তার নাকি কোনও নিশ্চয়তা নেই! সেখানে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়লে বা জখম হলে এমার্জেন্সি চিকিৎসা পরিষেবা মেলা খুবই কঠিন! ইত্যাদি ইত্যাদির ফলে ডুয়ার্সকে নাকি এখনও প্রথম শ্রেণির পর্যটনকেন্দ্রের মর্যাদা দেওয়া যায় না!

অথচ গত হপ্তায় লাটাগুড়ি পৌঁছে দেখা গেল চিত্রটা যে একেবারে অন্যরকম। সব হোটেল খচাখচ ভরতি, সাফারির জন্য মাঝরাতে উঠে লাইন, সন্ধেয় দোকান-বাজার জমজমাট। এই অস্বাভাবিক ভিড়ে বলাই বাহুল্য স্থানীয় সবাই বেশ অবাক এবং খুশি। কারণ জানতে গেলেই ফিকফিক হাসছেন দোকানিরা— 'আসলে পাহাড় এতদিন ধরে খুব হাসছিল। সেই অট্টহাসিতে আমরাই সব শুকিয়ে মরছিলাম। কয়েকদিন হল সে হাসি থেমেছে। তাই পর্যটকের পাল এখন ডুয়ার্সের আনাচকানাচে ছুটির ঠিকানা খুঁজছে।'

এই ব্যঙ্গোক্তি যদি কারও মনে অকারণে আঘাত করে থাকে তবে আমরা দুঃখিত। কিন্তু তাদের যুক্তিকেও খণ্ডন করা কঠিন— পাহাড়ের পর্যটকের ঘোরাফেরা নিয়মিত নিয়ন্ত্রণ করলেই স্বাভাবিক স্রোতেই পর্যটক বছরভর ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসাকে জাগিয়ে রাখতে পারে, বছরের আদ্দেক সময় শুকিয়ে থাকতে হয় না। 'কিন্তু সরকার তো তা না করে পাহাড়কে কাতুকুতু দিয়ে হাসাতে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এখন আর যাইব কই, অগতির গতি সেই ডুয়ার্স ভরসা।'

পাহাড়ে অশান্তির ফসল এর আগে ঘরে তুলেছে দিঘা-মন্দারমণির পর্যটন ব্যবসায়ীরাও, কিন্তু সে সময়ও দেখা গিয়েছে, আদিবাসী সংগঠনের পালটা প্রতিরোধে ডুয়ার্সের পর্যটনে ক্ষতিই হয়েছে। বাম-আমলের কথা ছেড়েই দিলাম, গত ছ'বছরে অনেক কিছু হলেও এ রাজ্যের পর্যটন উন্নয়নে ডুয়ার্সকে পাহাড়ের সঙ্গে জুড়ে ভাবা হয়নি কখনওই। ফলে সারা বছর পাহাড়ে টুরিস্ট থাকলেও ডুয়ার্সে তার ছিটেফোঁটাও মেলেনি। অথচ কালিম্পং বা ভুটানের টুরিস্ট রুটকে বাধ্যতামূলকভাবে ভায়া ডুয়ার্স করাটা কি খুবই কঠিন কাজ? বিদেশ ছেড়েই দিন, আমাদের অন্যান্য রাজ্যেও হিল স্টেশনের সঙ্গে ফুটহিলসকে জুড়ে দিয়ে পর্যটককে ছড়িয়ে দেওয়ার যে বাণিজ্যিক কৌশল দেখা যায় তা এখানে কোনও দিনই চোখে পড়েনি। হলে শিলিগুড়ির এমন অবস্থা থাকত না। 'সুইটজারল্যান্ডে' পৌঁছাবার আগের স্টেশন শিলিগুড়ি যে এখনও কেবল হাজার হাজার পর্যটকের মলমূত্রত্যাগের ট্রানজিট পয়েন্ট হয়েই রয়ে গিয়েছে।

তবু দেখে ভাল লাগে এই ভুসো গরমে ডুয়ার্সে 'নিরুপায়' ছুটি কাটাতে এসেও পর্যটক পরিবারের মুখে অনাবিল হাসি। আসলে ডুয়ার্সের আকাশ জঙ্গল নদী আর মানুষ যে বড় আন্তরিক, সব অভিমান ভুলে সবাইকে আপন করে নেয় বড় তাড়াতাড়ি!

চতুর্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৬-৩০ জুন ২০১৭

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৫
পাহাড়ের সমীকরণে কি ছোটখাটো ভুল ধরা পড়ল? ১৬
চায়ের ডুয়ার্স, ডুয়ার্সের চা ১০
চা-শিল্পে সুদিন আনতে চাই কেন্দ্র সরকারের উদাসীনতা ঝেড়ে র‍্যাপিড অ্যাকশন
উত্তরপক্ষ ৮
অভাব দক্ষ প্রশিক্ষকের, আরসেটি ট্রেনিং নিম্নমেধার শ্রমিককে কতদূর টানতে পারে?
পর্যটকের ডুয়ার্স ২২
উত্তরের ঐতিহ্যময় জটিলেশ্বর মন্দির
গজলডোবার চরে হর্স রাইডিং
ডুয়ার্স তরাই শতাব্দী এক্সপ্রেস ২০
জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব
ডুয়ার্সের পশুপাখি বিচিত্রা
বনমন্ত্রীর জেলায় তিন পার্কে হরিণ! ৩৭
নেড়িদের আশ্রম! অরিন্দম!! আশ্চর্যম্!!! ৩৮
ফলহারী ল্যাজ নাড়ে ডাকে ঘেউঘেউ ৩৯
বক্সাবনের নকশা বদল ৩৯
ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ১৪
লাল চন্দন নীল ছবি ২৯
তরাই উৎরাই ২৪
ডুয়ার্স থেকে শুরু ৩২
ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৪৪
নিয়মিত বিভাগ
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৪০
খুচরো ডুয়ার্স ৬
ডুয়ার্সের ডায়েরি ৩৫
শ্রীমতী ডুয়ার্স
সাজসজ্জার দেশজ কারুশিল্প প্রদর্শনী ২৬
ডুয়ার্সের ডিশ ২৬
এবারের শ্রীমতী ২৭
তর্ক চলুক ২৮
দিনরাত এসি-তে কতটা ক্ষতি হচ্ছে আপনার সন্তানের? ৪২

প্রচ্ছদ ছবি: অতনু সরখেল

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ শান্তনু সরকার
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস,
প্রকাশনা প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

খুচরো ডুয়ার্স

কোচিং মিডিয়াম

চকচকে ইংলিশ মিডিয়াম বলে কথা! উঠতে-বসতে-খেতে-শুতে-পড়তে-লিখতে কেবল খচ্চা আর খচ্চা! তা জজ-ম্যাজিস্ট্রেট বানাবার আশায় গার্জিয়ানরা মুখ বুজে খচ্চা করছিলেন। কিন্তু সে দিন হল মহারঙ্গ! ছাত্রছাত্রীরা ব্যাগ কাঁধে, জলের বোতল হাতে ইস্কুলে গিয়ে দেখে কী, ইস্কুল নেই! মানে আছে, তবে সেটা আর ইস্কুল নয়! হয়ে গিয়েছে কোচিং সেন্টার! মানে ভুয়ো ডাক্তার, ভুয়ো কবি, ভুয়ো আমলা ধরার হিড়িক পড়েছে কি না! তা থেকে ইস্কুলই বা বাদ যায় কেন? তাই বিপদ দেখে চকচকে ইংলিশ মিডিয়াম রাতারাতি হয়ে গিয়েছে কোচিং সেন্টার। টিচার হয়ে গিয়েছে কোচ! খোঁজ নিয়ে জানা গেল, নাইন থেকে কোনও অনুমতিই নেই সেই টিচিং, থুড়ি কোচিং অ্যাকাডেমির! কী কাণ্ড রে বাপ! এর পর যদি নার্সিং হোম রাতারাতি ফার্স্ট এইড সেন্টার হয়ে যায়, তবে? শিলিগুড়ির কাণ্ড।

শাবাশ দিগু

আদরে কেবল দোপেয়ের ছানা নয়, চারপেয়ে ছানারাও বাঁদর হয়। যেমন হয়েছিল দিগম্বর। অবশ্যি ছোটবেলায় তার নাম ছিল 'লালবাহাদুর'। থাকত বারোবিশা বিটে। সেখানে বনকর্মীদের এমন তুর্কিনাচন নাচিয়েছিল যে, বড় হওয়ার পর তাকে

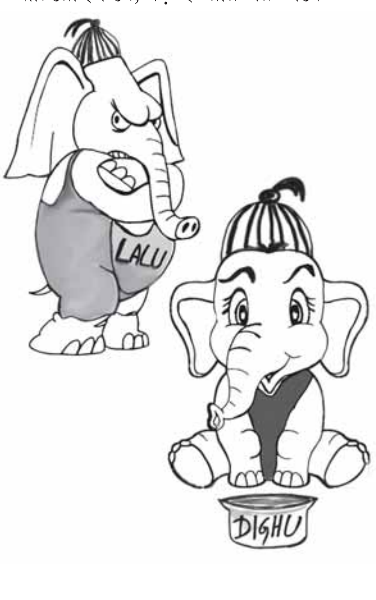

জলদাপাড়ায় পাঠিয়ে হাঁপ ছেড়েছিল তারা। মাহুতকে গুঁতো দেওয়া, মানুষ দেখলে শুঁড়ে পাথর তুলে ছুড়ে মারা, শিকল ছিঁড়ে লাগোয়া গ্রামে হানা দিয়ে গোরু বধ— ইত্যাকার দেশদ্রোহী, থুড়ি জঙ্গলদ্রোহী কর্মে ডিগ্রি পাওয়া লালবাহাদুরের নাম শুনলে বন মন্ত্রীও নাকি ঘাবড়ে যেতেন। অথচ সেই 'লালু' এখন 'ভেরি গুড হাতি'। পড়াশুনো করে এমন শান্ত আর কাজের হয়েছে যে, লোকে তাকে যাত্রাপ্রসাদের মতো মহাহাতির সঙ্গে তুলনা করছে। আর পাঁচটা হাতির তুলনায় দ্বিগুণ গতিতে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। সাত চড়েও রা কাড়ে না। আবার, এলাকার ভয়ানক গন্ডার তরোয়াল সিংকে লাথি মেরেও ভাগিয়ে দেয়। এখন তার নাম 'দিগম্বর'। শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে ভদ্রতা— এই আপ্তবাক্যি এখন দিগম্বরের সম্পদ।

ভয়হারা তারা

আগে যখন ডুয়ার্সের জঙ্গলে তেমন কেউ বেড়াতে আসত না, তখন অরণ্যপথে দোপেয়েদের দেখলে চারপেয়েরা লুকিয়ে পড়ত। ভাবত যে খুরহীন, থাবাহীন, পুচ্ছহীন

এরা কারা জঙ্গলে? ভূত নয় তো? চোরাশিকারিদেরও ভারী পরিশ্রম করতে হত গুলি করার জন্য। কিন্তু এখন ডুয়ার্সে মানুষই মানুষ! সিজন পড়লে রাশি রাশি টুরিস্ট আঠারো ইঞ্চি লেন্স আর চিপ্সের প্যাকেট নিয়ে কলরব করে বেড়ায়। তাই দোপেয়েদের দেখে দেখে ভয়কে জয় করে ফেলেছে বুনোরা। কিন্তু এই 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শুঁড়' নীতি নেওয়াটাই কাল হয়েছে তাদের। একদিকে যেমন পালিয়ে যাওয়ার বদলে গুঁতোতে আসছে, অন্য দিকে চোরাশিকারিদের দেখলে 'এমনি করে আমায় মারো' বলে এগিয়ে আসছে খুর দাপিয়ে। চিতারাও আর চোরের মতো ঢুকছে না গেরস্তের আঙিনায়। সব মিলিয়ে ঘোর সংকট! হাতি আর বাইসনদের নিয়ে সমীক্ষা করে এটাই বলছেন বনকর্তারা। মনে হয়, মানবসভ্যতার অসভ্যতা নিয়ে ভিডিয়ো দেখালে এরা আবার ভীত হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু দেখাবে কে? দোপেয়েদের বুঝি ভয় নেই?

সমস্যা

ডুয়ার্সের পাবলিক মাঝে মাঝে খবরের কাগজ পড়ে খুব ঘাবড়ে যায়। তা যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে বলেই না ঘাবড়ায়। এই যে ক'দিন আগে লেখা হল, জলপাইগুড়িতে অজানা জন্তু বেরিয়ে যার ঘাড়ে থাবা বসিয়েছে, তার হাইট ছ'ফিট। তবে জন্তুটি কত লম্বা ভাবুন। অথচ দেখা গেল, সে ব্যক্তি মেরেকেটে পাঁচ চার। আবার সে দিন জওয়ান ভাইরা শিলিগুড়িতে সন্দেহজনক থলে কুড়িয়ে এনে ভিতরে যে আফিম খুঁজে পেল, তার দাম এই কাগজে যদি পঁচানব্বই লাখ লেখে, তো ওই কাগজে লেখে দু'কোটি। কোথায় জানি আবার পড়া গেল 'রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত চারুচন্দ্র সান্যাল সরণী'! কী যে হয় কত্তা! এবার নির্ঘাত লিখবে যে, 'গীতাঞ্জলি রচিয়া নোবেল পাইয়াছিল রবীন্দ্রনাথ ভবন!' ভারী সমস্যা বটেক!

সভাপর্ব

দিনের বেলা কাজের ঠেলা। চা-বাগানের শ্রমিক বলে কথা। সময় কই? তাই সভা-টভা করলে রাতের বেলাতেই করতে হয়। তা সে দিনও ডাকা হয়েছিল এমন সভা।

চা-বাগানের ধারে, জঙ্গলের সীমানায় থাকা নালার পাশটিতে বেশ জমিয়ে বসেছিলেন সভাসদরা। কিন্তু এ দেশে শান্তিতে সভাসমিতি করার জো আছে গো কত্তা! বিপক্ষ মাঝেমধ্যে এমন হামলা চালায় যে, মাইক-স্টেজ-বক্তৃতা ফেলে বক্তা-শ্রোতা পালিয়ে বাঁচে না! সে দিনও তা-ই হল। সবে সভা জমে উঠেছে, হঠাৎ আক্রমণ! না, না! লাঠিসোঁটা-তির-বল্লম-বন্দুক-পাইপগান নিয়ে হামলা নয়! এমনকি ইষ্টক নিক্ষেপও নয়! কেবল নালার ওপার থেকে ভেসে আসা দুটো দেড়শো ডেসিবেলের 'হালুম' ধ্বনি! পলকে সভাস্থল খাঁ খাঁ। বুঝুন তবে, সেখানে বিপক্ষ কেমন 'পাওয়ার' রাখে! আসলে তেনারা গণতন্ত্র-সভা-সমিতি-ডায়ালগে বিশ্বাস করে না তো! তারা হালুমবাদী ডোরাকাটার দল। ঘোরতর

স্বৈরাচারী! যোগেশচন্দ্র চা-বাগানে এমনই চলছে আজকাল।

অনাটপৌরে

দশটা থেকে দুটো। আজ্ঞে না কত্তা! এ কোনও আপিস বা দোকানের খোলা থাকার টাইম না। এ হল রাজগঞ্জ হাসপাতালের খোলা থাকার সময়। তা চাঁদু! দিনের বেলা আফিম খাওনি তো? হাসপাতাল তো আটপৌরে, মানে অষ্ট প্রহর খোলা থাকার কথা। রাজগঞ্জে কি পাবলিক ঘড়ি ধরে অসুস্থ হয়? কী কই কত্তা! পাশেই কোয়ার্টার। স্টাফদের কেউ থাকতেই চায় না। তা গম্মেন্টের কোয়ার্টার কি ফাঁকা রাখা যায়? তাই সন্ধের পর চার প্রহর সুরাসেবন, জুয়া খেলন— এইসব করতে হয়। আর কে না জানে যে, ডাক্তার রাজ্যে কম পড়িয়াছে! তা-ও একখান করে ছিল ডাক্তার আর নার্স। কোথায় যে ভ্যানিশ হল তা গোমাতাই জানেন। বলিস কী! অভিযোগ-টভিযোগ? সে কত্ত করলুম স্যার! সবাই কয়, 'হবে'। কিন্তু ফিউচার ইনডেফিনাইট টেন্সের একটাই চাপ। সব অনির্দিষ্ট। তাই দেড় প্রহর চিকিচ্ছে, চার প্রহর জুয়া-দারু আর বাকি সময়টা অপেক্ষা করেই কাটছে হাসপাতালের। চেষ্টা করছি স্যার, এলাকার লোকদের বুঝিয়েসুঝিয়ে ওই দশটা থেকে দুটোর মধ্যে অসুস্থ হওয়ার জন্য।

কলি

সক্কাল সক্কাল গোডাউন খুলে চোখ রসগোল্লা হয়ে গিয়েছিল শিলিগুড়ির ব্যবসায়ীর। কে জানি রাতের বেলা সিঁধ কেটে ঢুকেছিল সেথা! নিয়ে গিয়েছে মেলা জিনিসপত্র। সঙ্গে টেবিলে রাখা দামি মোবাইলটাও। ব্যবসায়ী বেচারা প্রাথমিক ধাক্কা সামলে চুরি যাওয়া মোবাইল নাম্বারে ফোন লাগালেন আগে। এসব ক্ষেত্রে ফোন ধরে কোন আহাম্মক? তবুও লাগালেন ফোন। আর কী আশ্চর্য কাণ্ড কত্তা! রিং হল সেই ফোনে, আর তারপরেই একজন বলল, 'হ্যাল্লো!' ব্যবসায়ী বললেন, 'আপনি কি চোর?' সে বললে, 'আমি চোর। চুরি করেছি, বেশ করেছি। তা আপনি চাইলে সিম কার্ড ফেরত দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু মোবাইল সেট দিতে পারবনি!' চোরের ধমক শুনে ব্যবসায়ী বেচারা তাড়াতাড়ি থানায় ছুটলেও অকুতোভয় চোরবাবাজিকে আর ফোনে পায়নি পুলিশ। বাপ রে! এই না হলে কলিকাল!

টুক্রাণু

গন্ডার হত্যায় যুবককে কারাগারে পাঠাল আলিপুরদুয়ার আদালত। লাভার এক হোটেলে ঘর বুক করতে হাজির এক হরিণ। পাথরঝোরা চা-বাগানের পথে সন্তান প্রসব জঙ্গলবাসী হাতিনির। 'গ্রিন বক্সা ক্লিন বক্সা' স্লোগান দিয়ে বক্সাকে স্বচ্ছ করার প্রতিজ্ঞা গম্মেন্টের। জলপাইগুড়িতে গেরস্তর বাড়িতে খাঁচার পাখি ভক্ষণ করতে এসে পিঞ্জরে পেঁচিয়ে আটক অজগর। নকশালবাড়িতে হাতিদের চরমপন্থী আন্দোলন না থামায় ঘরবাড়ি ভাঙছেই। সোনাদার কাছে গুম্ফায় ধস। আলিপুরদুয়ারে সরকারি আলো দিব্যি জ্বলছে হুকিং পদ্ধতিতে। আলিপুরদয়ারেই বিধায়ক সৌরভবাবুকে ঝাড়ু হাতে রাস্তায় দেখা গিয়েছে। অজ্ঞাত কারণে পাবলিক কোচবিহারের হাসপাতালে অভিযোগ জমা দেওয়ার বাক্সে টাকাপয়সা ফেলছে। নিয়মানুসারে গত পক্ষেও জাল টাকা পাওয়া গিয়েছে মালদায়। চালসায় উদ্ধার আহত ব্রহ্মচারী ময়ূর।

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২

শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪

জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩

মালবাজার
বিশ্বনাথ বাগচি ৯৮৩২৬৮৩৯৮৮

চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪

বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০

বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২

লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায় ৯০০২৪০৯৮৯৩

ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮

ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯

আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭

কোচবিহার
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
৯৮৫১২৩৪৮৮৯

মাথাভাঙা
নেপাল সাহা ৮৯৬৭৯৯৫৮৮৭

মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১

রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২

বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

অভাব দক্ষ প্রশিক্ষকের, আরসেটি ট্রেনিং নিম্নমেধার শ্রমিককে কতদূর টানতে পারে?

উত্তরপক্ষ

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

সারা বিশ্ব জুড়ে কমবেশি আর্থিক মন্দা একটানা ২০০৮ সাল থেকে চলে আসছে। এত দীর্ঘস্থায়ী আর্থিক সংকট ইতিপূর্বে দেখা গিয়েছে কি না তা গবেষণার বিষয়। মন্দা চললে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়, উৎপাদনের মাত্রা কম হতে থাকে, বেকারত্ব বেড়ে যায়। নিম্নমেধার শ্রমিককুল এই অবস্থায় ব্যাপক হারে কর্মচ্যুত হয়। কাজের সন্ধানে রাজ্য ছেড়ে, কখনও দেশ ছেড়ে অনিশ্চিত জীবনের পথে শ্রমিকরা যাত্রা করে।

উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে যেসব ট্রেন কর্ণাটক, কেরালা বা তামিলনাড়ু যাত্রা করে, সেইসব ট্রেনে প্রতিদিন বহু মানুষ কাজের সন্ধানে পাড়ি দেয়। এই শ্রমিকদের বেশির ভাগ অদক্ষ শ্রমিক, যারা কেবলমাত্র কায়িক শ্রমের উপর নির্ভরশীল। নিজের গ্রাম, পরিবার, সন্তানরা রয়ে যায়, পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীকে চলে যেতে হয় দূর-দূরান্তরে। তারা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অসুখবিসুখের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকে। এক বেসরকারি সংস্থার কর্তাব্যক্তি কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন, ভিন রাজ্যে বিনা চিকিৎসায় প্রতি বছর কমপক্ষে তিন হাজার মানুষের মৃত্যু হয়— যারা কাজের সন্ধানে একদিন দূর যাত্রা করেছিল। তবে এমন তথ্য কখনও সঠিক বলা যায় না।

কিছুদিন আগে কেরালায় এমন একজন শ্রমিকের ট্রেন থেকে পড়ে একটি পা কাটা গিয়েছিল। তরুণ কিশোরটি পঙ্গু হয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়ে জলপাইগুড়ির গ্রামে ফিরে এসেছিল। ক্ষতিপূরণের সরকারি মামলা চলছিল, কিন্তু সেই মামলা তদবির করাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিছুটা যোগাযোগ, আইনজীবীর সঙ্গে কথোপকথন আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে চালিয়েছিলাম। পরবর্তীতে সে আর যোগাযোগ রাখেনি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোন বা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরেজা মে— প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্লোগান তুলেছেন, ‘কর্মী নিয়োগে স্থানীয়দের অর্থাৎ ভূমিপুত্রদের প্রশ্নাতীত প্রাধান্য দিতে হবে।’ এবং চাকরিপ্রার্থী বিদেশিদের ভিসা ব্যবস্থায় দিন দিন কড়াকড়ির মাত্রা বাড়ছে।

ভারতীয় মেধা এবং শ্রমক্ষমতা পক্ষান্তরে মার্কিন অর্থনীতিতে স্বল্প মূল্যের মেধাবান সরবরাহ করে বলেই ওই দেশের প্রভূত রোজগার বেড়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সস্তা শ্রমিক মার্কিন বিনিয়োগকারীদের চিরকাল আকর্ষণ করেছে। তাই তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতীয়দের এত রমরমা।

আমার পরিচিত এক যুবক ১২ বছর মার্কিন দেশে কাটিয়ে সম্প্রতি দেশে ফিরে এসেছে। সে চিরকাল মেধাবী ছিল। কিন্তু ওই দীর্ঘ ১২ বছর প্রতিনিয়ত সে হীনম্মন্যতায় ভুগেছে। একই পদে সাদা চামড়ার মার্কিন নাগরিক তার দ্বিগুণ বেতন পেত। ভারতীয়দের সর্বদাই গাধার খাটুনি খাটতে হয়। এই সামাজিক ভেদ অনেক মার্কিন প্রবাসীকেই পীড়িত করে থাকে।

তবে এটা সত্যি, মেধার জোরেই বহু ভারতীয় তরুণ বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার আজকের আলোচনা আমাদের দেশের দক্ষতাহীন নিম্নমেধার মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করা নিয়ে। আমাদের দেশে দক্ষ শ্রমিকদের এখনও কাজের অভাব নেই। কিছু কাজ আছে, যাতে মেধার চেয়ে দক্ষতার অনেক বেশি দরকার। যেমন দর্জির কাজ, জলের পাইপ/কল সারাই, বিদ্যুতের লাইন সারাই, রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি— এদের কিন্তু কাজের অভাব নেই। আবার বহু সময় এই দক্ষ শ্রমিককে ডেকে পাঠালে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ৪-৬ ঘণ্টা পর বা পরদিন আসবে। জলের পাম্প সারাই করে এমন একজন দক্ষ

সুজিত বিশ্বাস, রান্নার মশলা তৈরির উদ্যোক্তা

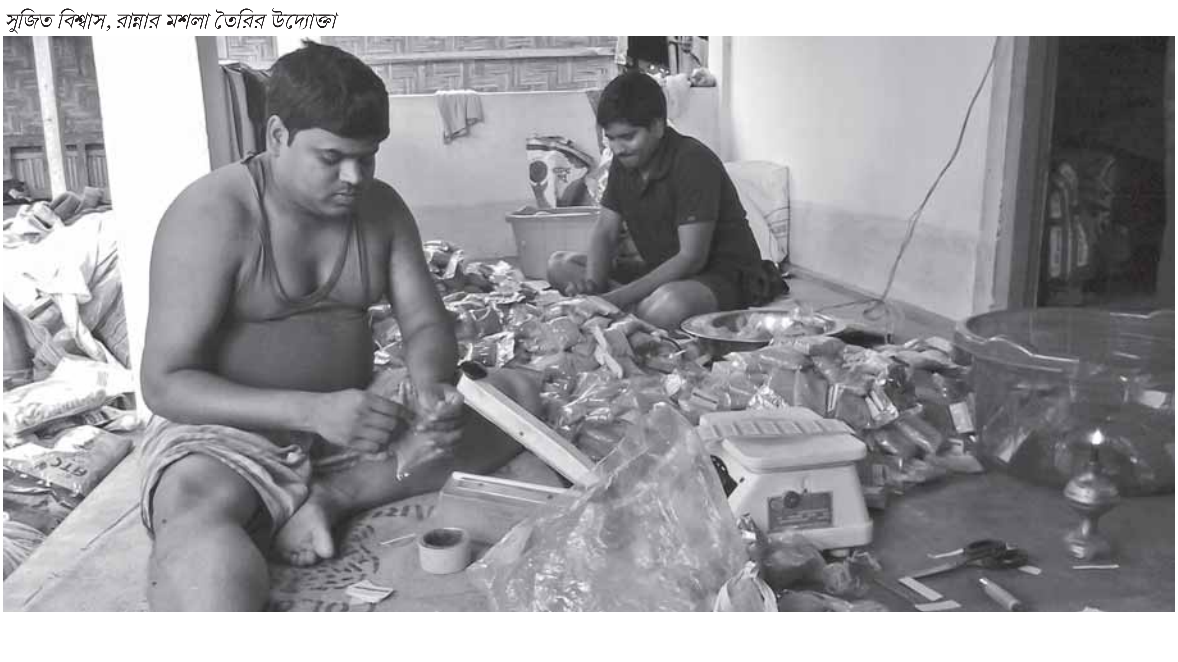

মিস্ত্রিকে আমি জানি— সে একটি তিন কামরার ফ্ল্যাটে বাস করে এবং দামি বাইকে চেপে গ্রাহকের বাড়ি আসে। অনেক শ্রমিকের হয়ত স্বাভাবিক দক্ষতা আছে, কিন্তু যদি তাকে আর একটু ঘষে-মেজে নেওয়া হয়, তবে তার দক্ষতা এবং রোজগার বৃদ্ধি পাবে। এই কাজটিকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে কর্ণাটকের ধর্মস্থলা গ্রামে এসডিএমই ট্রাস্ট, কানাড়া ব্যাঙ্ক এবং সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক-এর উদ্যোগে এক সর্বাঙ্গীণ প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছিল। নাম দেওয়া হয় রুডসেটি— রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। এঁরা গ্রামে গিয়ে রুডসেটি-র প্রচার করেন এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেন। প্রশিক্ষণকেন্দ্রে থাকা ছিল বাধ্যতামূলক। থাকা, খাওয়া এবং প্রশিক্ষণ বিনামূল্যে। প্রশিক্ষণের পর টানা দু'বছর প্রশিক্ষণপ্রাপ্তের সঙ্গে সংস্থা যোগাযোগ রক্ষা করা হত, যাতে সে নিজের কর্মসংস্থান করতে পারে। এসব নয়ের দশকের কথা। শ্রদ্ধেয় ডঃ বীরেন্দ্র হেগড়ে মহাশয় নিরলস সমর্থন জুগিয়েছেন এই কর্মকাণ্ডে। বিদেশি অতিথি থেকে আমাদের দেশের মন্ত্রীদের রুডসেটি-তে নিত্য আনাগোনা। এই মডেলকে কাজে লাগিয়ে ইউপিএ সরকার দেশের লিড ব্যাঙ্কগুলোকে নিজ নিজ জেলায় আরসেটি (রুরাল সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট) তৈরি করার কথা বলে। গিত ১০ বছরের মধ্যে সারা দেশে আরসেটি-র সংখ্যা ৫০০ অতিক্রান্ত।

সরকার চাইছিল, ব্যাঙ্ক নিজেই এন্টারপ্রেনিয়র (উদ্যোগী) চিহ্নিত করে তাদের ট্রেড বাছাই করে মূলত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেবে, এবং প্রয়োজনে তাদের ব্যাঙ্ক লোনের ব্যবস্থা করে স্থায়ী রোজগারের ব্যবস্থা করে দেবে। একটানা দু'বছর উদ্যোগীর উপর নজরদারি কায়েম রাখবে, যাতে তার কোনওরকম সাহায্যের প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করা যায়। সরকার আশা করে, যাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থানের হার (সেটলমেন্ট রেশিয়ো) কমপক্ষে ৭০ শতাংশে পৌঁছানো সম্ভব হয়। আরসেটি-র একটা কমন স্লোগান হল, 'অল্প সময়ের প্রশিক্ষণ কিন্তু কর্মসংস্থান বেশি'।

আগেই বলেছি, 'প্রশিক্ষণকেন্দ্রে থেকে ট্রেনিং নিতে হবে।' সকালবেলায় যোগব্যায়াম, তারপর জলখাবার, ৯টার মধ্যে প্রার্থনাসংগীত সেরে ক্লাস শুরু। দুপুরে খাওয়াদাওয়া এবং কিছুটা বিশ্রাম। প্রতিদিন ক্লাস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গত দিনের প্রশিক্ষণের সংক্ষিপ্ত রূপ পাঠ করে শোনাতে হবে। এটাকে ছোট করে বলা হয় 'মিলি' (মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট লেস্‌ন লার্ন্ট

পার্থ কর, পানীয় জল তৈরির কারখানার প্রতিষ্ঠাতা

ইয়েসটারডে)। শিক্ষাকেন্দ্রের ঘরদোর পরিচ্ছন্ন রাখা বা কেন্দ্রের বাগানে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শ্রমদান করা বাধ্যতামূলক। প্রয়োজনে অনেক রাত পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা আনন্দেই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

মোদিজি সরকারে আসার পরই স্কিল ইন্ডিয়ার ডাক দিয়েছিলেন, যা আরসেটি-র ম্যানডেটের সঙ্গে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'দক্ষতা বাড়াও, কর্মসংস্থান বাড়বেই।'

কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা মনে করেন, গরিব নিম্নমেধার মানুষদের প্রশিক্ষণ দেওয়া অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। আজকের দুনিয়ায় প্রশিক্ষণ অর্থ জ্ঞানগর্ভ ভাষণ নয়— চাই দক্ষতা বৃদ্ধির উপযোগী প্রশিক্ষক। পেশাগত কারণে ব্যক্তিগতভাবে গ্রাম উন্নয়নের কাজে এখনও সরাসরি যুক্ত আছি। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক, সরকারি দপ্তরের স্পনসর করা প্রার্থী ছাড়া উত্তরবঙ্গের আরসেটি-গুলোতে নিজেরা নিজেদের খরচে গ্রামের বেকার যুবক-যুবতীদের কি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে? এর উত্তর— 'না'। কোথাও যদি দু'-একটা এমন দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে, তবে তা একান্তই ব্যতিক্রম। আমি একান্তে ডিআরডিসি-র পীযূষ বিশ্বাস এবং উৎসব রায়কে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে একই রকম উত্তর পেয়েছি— 'দক্ষ প্রশিক্ষকের একান্ত অভাব, তা ছাড়া বস্তাপচা স্কিমগুলোর ট্রেনিং করিয়ে কর্মসংস্থান বাড়ানো সম্ভব নয়।'

> উত্তরবঙ্গের আরসেটি-গুলো চরম অবহেলিত। নিজস্ব বাড়ি নেই, হস্টেলের নানা সমস্যা আছে, এমনকি প্রশিক্ষার্থীদের মনোরঞ্জনের জন্য কোনও টিভির ব্যবস্থাও নেই।

সুব্রত মজুমদার একটি বেসরকারি সংস্থায় দীর্ঘদিন কর্মরত। হাতেকলমে গ্রাম উন্নয়ন কাজে তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা আছে। তিনি বলছিলেন, 'প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের পূর্ণ ব্যবস্থা করা দরকার। যে কথাই বলতে পারে না, সে কীভাবে ভাল প্রশিক্ষক হবে?'

উত্তরবঙ্গের আরসেটি-গুলো চরম অবহেলিত। নিজস্ব বাড়ি নেই, হস্টেলের নানা সমস্যা আছে, এমনকি প্রশিক্ষার্থীদের মনোরঞ্জনের জন্য কোনও টিভির ব্যবস্থাও নেই। কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল— আরসেটি-র বাড়ি বানানোর জন্য তারা এক কোটি টাকা দেবে একটি শর্তে। রাজ্যকে বিনামূল্যে বা সামান্য রাজস্ব দিয়ে এক একর জায়গা আরসেটি-র জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের এলাকায় সে ব্যবস্থা এখনও হয়নি। তা ছাড়া দক্ষ প্রশিক্ষণের জন্য যেমন ল্যাবরেটরি ও কারখানা দরকার, তার কিছুই নেই। বর্তমান নিয়ম অনুসারে কমপক্ষে দশ দিনের প্রশিক্ষণ হতে পারে এবং তা চার থেকে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত চলতে পারে।

প্রশিক্ষণকেন্দ্রের কর্মীদের দায়বদ্ধতা প্রশংসার দাবি রাখে, কিন্তু তাতে কি দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের মান বাড়বে?

ব্যাঙ্কের সামনে একটা সুযোগ এসেছে। শুধুমাত্র সরকারি প্রকল্পে ঋণ দিয়ে ব্যাঙ্কগুলো নাকি এনপিএ বাড়াতে চাইছে না। তাহলে তারা নিজেরা উদ্যোগী চিহ্নিত করে তাদের কাউন্সেলিং করে, দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের পর ঋণ দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে ঋণের সদ্ব্যবহার হবে এবং স্বরোজগারি উদ্যোগপতি তৈরি করা সম্ভব হবে। তবে এটা স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে, সফ্‌ট স্কিল ট্রেনিং-এ আরসেটি-র দক্ষতা প্রশ্নাতীতভাবে আদর্শমানের। একজন আত্মমর্যাদাহীন বেকার যুবক প্রশিক্ষণকেন্দ্রে যদি দু'সপ্তাহ কাটায়, তবে তার আত্মবিশ্বাস বাড়বেই, এবং সে নতুন চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে। এখানেই আরসেটি-র মূল সার্থকতা।

জলপাইগুড়ির আইটিপিএ ভবন

চা-শিল্পে সুদিন আনতে চাই কেন্দ্র সরকারের উদাসীনতা ঝেড়ে র‍্যাপিড অ্যাকশন

ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টারস' অ্যাসোসিয়েশন-এর শতবর্ষে 'এখন ডুয়ার্স'কে বিশেষ খোলামেলা সাক্ষাৎকার দিলেন আইটিপিএ-র চা-বাগান মালিক সংগঠনের মুখ্য উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী। সাক্ষাৎকারটি পেশ করছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা** তাঁর ধারাবাহিক প্রতিবেদনের **অষ্টাদশ পর্বে**।

চায়ের ডুয়ার্স ডুয়ার্সের চা

চা-শিল্পের সমস্যাকে গভীরভাবে বুঝতে গেলে উপর উপর কোনও কমিটি গড়ে বা ছোটখাটো দু'-একটা সভাসমিতি করে সমস্যাকে চিহ্নিত করলে চলবে না। সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং তা করতে গেলে 'র‍্যাপিড অবজার্ভেটরি টিম' গঠন করা একান্তই প্রয়োজন। অর্থাৎ কাজ করতে হবে দ্রুতগতিতে। দেখছি, করছি, ভাবব— এইভাবে চিন্তা করতে থাকলে সমস্যার পাহাড় তৈরি হয়ে চা-শিল্পকে একেবারে শেষ করে দেবে। এমনিতেই উত্তরবঙ্গে চা-শিল্প একেবারে খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। কাজেই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনদের নিয়েই 'র‍্যাপিড অবজার্ভেটরি টিম' গঠিত হোক। তাতে টি বোর্ডের প্রতিনিধি, প্ল্যান্টারস' ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধি, শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধি, সরকারপক্ষের লোকজন, বিধায়করা থাকলে কাজে গতিশীলতা আসবে। জলপাইগুড়ির যোগেশচন্দ্র মেমোরিয়াল হলের নিজস্ব অফিসে বসে 'এখন ডুয়ার্স'কে দেওয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে চা-শিল্পের সমস্যা সমাধানের পথ শীর্ষক আলোচনায় নিজের মতামত এইভাবে ব্যক্ত করলেন ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টারস' অ্যাসোসিয়েশন-এর (আইটিপিএ) চা-বাগান মালিক সংগঠনের মুখ্য উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী। তাঁর মতে, 'চা-বাগিচার ক্রমবর্ধমান সমস্যা সমাধানের সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বচ্ছতা সহকারে প্রয়োগ করতে হলে দ্রুত চিন্তাভাবনা, দ্রুত অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি এবং তাকে দ্রুত বাস্তবায়িত করতে হবে, গদাইলশকরি চালে চললে হবে না। প্রভূত প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার অধিকারী বাগান মালিকদের মুখ্য সংগঠক অমিতাংশুবাবু মনে করেন, র‍্যাপিড অবজার্ভেশনের লক্ষ্যে টিমকে থেমে থাকলে চলবে না। নিয়মিতভাবে গতিপ্রকৃতিতে লক্ষ রাখতে হবে, শ্রম দপ্তরের সহযোগিতায় সুনির্দিষ্ট পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সঠিক 'গেমপ্ল্যান' করতে হবে, যেটা এই মুহূর্তে চা-শিল্পের অন্যতম

দাবি। অমিতাংশুবাবু মনে করেন, শ্রম দপ্তর, চা মালিকদের সংগঠন, টি বোর্ড নির্দিষ্ট কিছু সমস্যাকে চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে 'টাস্ক ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম' নিয়ে নির্দিষ্ট অভিমুখে এগলে অবশ্যই কাজ হবে।

চা-শিল্পের বর্তমান অবস্থায় অমিতাংশুবাবুকে সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করলে কিছুটা হতাশা নিয়েই সরকারের কিছু নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরলেন তিনি। পাশাপাশি তুলে ধরলেন রাজ্য সরকারের কিছু ইতিবাচক দিকও। দু'টি বিষয়কেই পাশাপাশি রাখলে যে বিষয়টা উঠে আসে, সেটা নিয়েই অমিতাংশুবাবুর বক্তব্যের নির্যাস বার করে আনা যেতে পারে। অমিতাংশুবাবুর মতে, বিদেশের বাজারে ভারতীয় চা তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। ভারতীয় চায়ে অধিক উৎপাদন খরচ। একটি গাছ লাগানো হয়, তারপর জলসিঞ্চন, পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য ওষুধ প্রয়োগ করা, বিভিন্নরকমভাবে লালনপালন করার একটা খরচখরচা আছে। ওষুধ, জল, পেস্টিসাইড বাবদ খরচ করার পর চা গাছ পাতা দেয়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি আছে। তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে জলসেচ, শেড ট্রি— বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের পর গাছ পাতা দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, চা যেহেতু বাগিচা ফসল, এখনও কৃষিক্ষেত্রে চা-শিল্পের অন্তর্ভুক্তিকরণ ঘটল না। ফলত কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রগুলি যে যে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পায়, চা-বাগান সেই সুবিধা থেকে আজও বঞ্চিত। বিগত দিনে বাগিচাতে কোয়ার্টার নির্মাণে নাবার্ড ভরতুকির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করত। কিন্তু দীর্ঘদিন হল, মালিকরা বাগানে কোয়ার্টার নির্মাণের ক্ষেত্রে নাবার্ড-এর কোনওরকম অর্থনৈতিক সহযোগিতা পাচ্ছে না। কিছু কিছু মালিক বিচ্ছিন্নভাবে বাগানে এখনও শ্রমিক আবাস নির্মাণ করছেন। অথচ সরকার উদাসীন। অমিতাংশুবাবুর আক্ষেপ, বন্ধ এবং রুগ্‌ণ চা-বাগানগুলো তো বটেই, যে চা-বাগিচার মাধ্যমে সরকার কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে, সেই সমস্ত চা-বাগিচায় বিদ্যুৎ মাশুল এত বেশি হবে কেন? কেন বাণিজ্যিক হারে উচ্চ বিদ্যুৎ মাশুল দিতে হবে? মাশুল কি কমানো যায় না? তাহলে বাগান মালিকরা তো কিছুটা রিলিফ পান। অমিতাংশুবাবুর সুস্পষ্ট দাবি—

১) বাগানে আবাস নির্মাণে নাবার্ড-এর অর্থনৈতিক সহযোগিতা।

২) বিদ্যুৎ মাশুল নমনীয় করা। বন্ধ এবং রুগ্‌ণ বাগানগুলোর ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান।

৩) কৃষিক্ষেত্রের সুযোগ-সুবিধাগুলো যেন চা-শিল্প পায়, সে বিষয়ে টি বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চলতি আইন সংশোধন করা।

সরকারি নীতি সম্পর্কে কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করে খোলাখুলিভাবেই চা-শিল্পের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের যে নজর কম তা তুলে ধরেন অমিতাংশুবাবু। তাঁর যুক্তি, 'একচেটিয়াভাবে ভারতীয় চা বৈদেশিক মুদ্রা এনে দিয়েছে। বিশ্বের বাজারে এক নম্বর স্থান দখল করেছিল ভারতীয় চা। অথচ সাম্প্রতিককালে কেনিয়া, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া চা তৈরি করছে, বিক্রি করছে, লাভ করছে, বৈদেশিক বাজারও ধরে ফেলেছে। কারণ ওদের দেশে সরকার সরাসরিভাবে চা-শিল্পকে সহযোগিতা করছে, আর আমাদের দেশের সরকার চা-শিল্পের প্রতি উদাসীনতার নীতি গ্রহণ করেছে বলে সার্বিকভাবে চা-শিল্প নিয়ে কেউই ভাবছে না।'

অমিতাংশুবাবুর কথায়— একটা সদর্থক ভাবনা, দৌড়াদৌড়ি, গতিশীলতা বৃদ্ধির প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে। এই ধরনের উদ্যোগ আরও আগে নেওয়া প্রয়োজন ছিল বলে অমিতাংশুবাবু মনে করেন।

চা-শিল্পের সমস্যার ক্ষেত্রে সরকারকে প্ল্যান্টারস' অ্যাসোসিয়েশনগুলো কীভাবে সহযোগিতা করতে পারে— এই প্রশ্নের উত্তরে অমিতাংশুবাবুর কিঞ্চিৎ অভিমান লক্ষ করলাম আলাপচারিতায়। তাঁর মতে, 'চা-শিল্পের সমস্যাকে কারা বুঝবে? ঠান্ডা ঘরে বসে থাকা মানুষজনরা নিশ্চয়ই নন। আর বুঝতে হলে তাঁদের ফিল্ডে যেতে হবে, শিল্পের সমস্যার চরিত্রটাকে উপলব্ধি করতে হবে। প্ল্যান্টারস' অ্যাসোসিয়েশনের বিশাল দায়িত্ব— চা-বাগান মালিক খরচখরচা, দায়দায়িত্ব মিটিয়ে যাতে দুটো পয়সা মুনাফা করতে পারেন— একদিকে যেমন সেটিকে

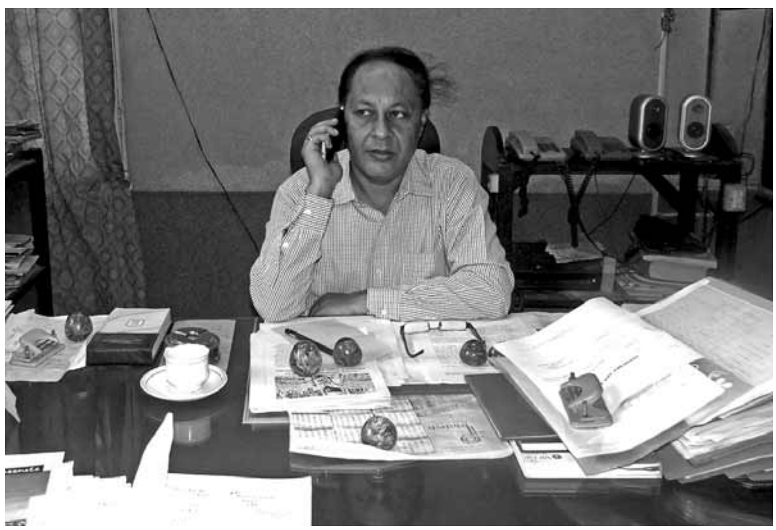

এখন ডুয়ার্সকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন আইটিপিএ জলপাইগুড়ি জেলা শাখার সচিব অমিতাংশু চক্রবর্তী

সুনিশ্চিত করা, অন্য দিকে শ্রমিকরা যাতে ন্যায্য মজুরি পান, টি প্ল্যান্টেশন অ্যাক্ট-এর সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত না হন, সেটিকেও সুনিশ্চিত করা। অর্থাৎ বাগান পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিটি সমস্যার গভীরে ঢুকতে হয় প্ল্যান্টারস' অ্যাসোসিয়েশনগুলোকে। মালিকপক্ষের সমস্যা, প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়, ট্রেড ইউনিয়ন এবং মালিকপক্ষের বিবাদেও সুপরামর্শ প্রদান করা, শ্রম দপ্তরের সঙ্গে নিবিড় সমন্বয় রেখে কাজ করা। কারণ চা-শিল্প বহির্ভূত আধিকারিকরা তো সমস্যার রুটটা জানেনই না, তাঁরা সমাধান করবেন কেমন করে? আর টি প্ল্যান্টারস' অ্যাসোসিয়েশন দিনের পর দিন বাগানগুলো নিয়ে পড়ে আছে, শিল্প নিয়ে পড়াশোনা করছে, গবেষণা করছে, গবেষণালব্ধ ফল প্রয়োগ করছে বাগিচাগুলোতে। সফল হলে সুনাম কার হচ্ছে?— হচ্ছে ভারতীয় চায়ের।

রাজ্য সরকারের ভূমিকার বিষয়ে প্রশ্ন করাতে অমিতাংশুবাবুর যুক্তি, অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বর্তমান রাজ্য সরকারের চা-শিল্পকে বাঁচাবার একটা প্রয়াস তিনি লক্ষ করছেন। রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বারংবার উত্তরবঙ্গে ছুটে আসছেন। উন্নয়নের পাশাপাশি চা-শিল্পকে নিয়ে আলাদা করে ভাবছেন। টি অ্যাডভাইসরি কমিটি তৈরি করে দিয়েছেন। বন্ধ চা-বাগানে ফাউলাই বা বাগানগুলোতে র‍্যাশনিং ব্যবস্থা জারি আছে। কোনও কোনও চা-বাগিচাক্ষেত্রে সেল্ফ হেল্প গ্রুপকে কাজে লাগানো হচ্ছে। নিরন্তর মিটিং করছেন ডানকানস গ্রুপের সঙ্গে বন্ধ চা-বাগিচাগুলো খোলার ব্যাপারেও। বীরপাড়া, হান্টাপাড়া, জয়বীরপাড়া খুলে গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার পাঁচটি বন্ধ চা-বাগিচা নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ

ফলে প্ল্যান্টারস' অ্যাসোসিয়েশন এই সুনাম আনার পিছনের অদৃশ্য কারিগর। ক্ষোভ প্রকাশ করে অমিতাংশুবাবুর মন্তব্য, 'অথচ প্ল্যান্টারস' অ্যাসোসিয়েশনগুলোর সঙ্গে নিয়মতিভাবে সরকার বা তাদের প্রতিনিধিরা বসেন না। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা কাজ করে।' উদাহরণ হিসাবে অমিতাংশুবাবুর যুক্তি, অনাবৃষ্টির সময়ে চায়ের গাছকে লড়তে হয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে। একটা গাছকে প্রবল প্রতিকূলতার হাত থেকে বাঁচতে লড়াই করতে করতে এগতে হয়। অনাবৃষ্টির সময়ে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হল জল। চা গাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল সরবরাহের জন্য হয়তো পিএইচই বা পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ তথা জনস্বাস্থ্যমন্ত্রককে জানানো হয়। এ ক্ষেত্রে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। কারণ পর্যাপ্ত জল যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ না পায় তাহলে চা গাছ তীব্র গরমে ঝলসে যাবে, বাঁচবে না। তাই দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন। অথচ দেখা যায়, ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বহু সময় লেগে যাচ্ছে। অনেক সময় লেগে যাওয়ার ফলে বিকল্প জলের উৎস তৈরি করতে মালিকের অনেকগুলি অনুৎপাদক খরচা বেড়ে গেল। তাই চা বাগিচাশিল্পে দীর্ঘসূত্রিতাকে কাটিয়ে ওঠার মানসিকতার উপর ব্যাপক জোর দেওয়ার পক্ষে অমিতাংশুবাবু।

চা-শিল্পের সংকট থেকে বার হবার ক্ষেত্রে কতকগুলো মূল্যবান প্রস্তাব উঠে এসেছে খোলাখুলি আলোচনায়। যদিও প্রস্তাব এবং চিন্তাভাবনাগুলো একান্তভাবেই তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত এবং তিনি আর কারও সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেননি— এ কথা জানিয়ে নিছক শেয়ার করার মানসিকতা নিয়েই তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য তুলে ধরেন। তাঁর মতে, 'চা গাছের সমস্যা অতিবৃষ্টি, আবার অনাবৃষ্টিও। আবহাওয়া ভীষণভাবেই পরিবর্তনশীল সাম্প্রতিককালে। প্রকৃতিও যেভাবে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে তা চা-বাগিচার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংবেদনশীল। গাছ থেকে সারা বছরের উৎপাদন সুনিশ্চিত করতে গেলে বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সার্বিকভাবে বাগিচাশিল্পের উন্নয়ন করতে গেলে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে মাটি, গাছ, উৎপাদন নিয়ে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।' চা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, উৎপাদনের পর কাঁচা চা-পাতা ফ্যাক্টরিতে গেলে সেটাকে প্রসেস করার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, সঠিকভাবে বাজার ধরার জন্য মার্কেটিং এগজিকিউটিভ নিয়োগ, আইনজাত দিকগুলো দেখাশোনা করার জন্য আইনজীবী নিয়োগ— একটা বাগিচায় খরচার শতেক দিক রয়েছে। গোদের উপর বিষফোড়ার মতো প্ল্যান্টারদের কাছে রয়েছে টি প্ল্যান্টেশন অ্যাক্ট, যার কথামতো বাসস্থান, পানীয় জল, শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্যর সুবিধা দিতে হবে। যেখানে সরকারও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। বাগিচাগুলোতে পানীয় জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের কাজে খামতি থাকলেও খাদ্যসুরক্ষাব্যবস্থায় অন্ত্যোদয় যোজনায় ২ টাকা কেজি চাল, বাগান শ্রমিকদের ৪০ পয়সা করে ৩৫ কেজি পরিবারপিছু— সরকারের এই নীতি চা-বাগিচাগুলোতে কিছুটা হলেও দারিদ্র দূর করতে সহায়ক হয়েছে বলে মনে করেন অমিতাংশুবাবু। ফাউলাই প্রকল্পে বন্ধ চা-বাগানগুলোর পরিবার বেঁচে গেলেও এই নীতিকে সরকার অন্যভাবে প্রয়োগ করতে পারত বলে তাঁর যুক্তি। তাঁর মতে, সরকার ফাউলাইয়ের অর্থ দিচ্ছে প্রতি মাসে শ্রমিকদেরকে। তারা কোনও প্রকার কাজ না করেই ফাউলাইয়ের টাকা পাচ্ছে। বাগানে র‍্যাশনও পাচ্ছে, ২ টাকা কেজি দরে চালও। মনে রাখতে হবে, ফাউলাইয়ের অর্থ শ্রমিকরা পাচ্ছে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ চা-বাগিচায়, যেখানে কোনও মালিক নেই। নতুন যে মালিক বাগান খুলতে আসবে, সরকার তার সঙ্গে এই মোতাবেক চুক্তি করতে পারে যে, ফাউলাইয়ের টাকাটাই সরকার অন্যভাবে শ্রমিকদের ভরতুকি দেবে বাগান বাঁচানোর স্বার্থে। সে টি অ্যাডভাইসরি বোর্ড-এর মাধ্যমেই হোক বা পানীয় জল, শ্রমিক আবাস, পরিকাঠামো উন্নয়ন বা স্বাস্থ্য খাতেই হোক না কেন। মাসে ১৫০০ টাকা প্রতি স্থায়ী শ্রমিকপিছু সরকার যদি বন্ধ বাগান, যেমন বান্দাপানি বা ঢেকলাপাড়াকে ভরতুকি দেয় তাহলে মালিকপক্ষের কাছ থেকে নিশ্চিত আশ্বাস নেওয়া যেতে পারে এরকমভাবে যে, যে খাতে তিন বছর সরকার ভরতুকি দেবে, সেই তিন বছরে মালিক নতুন গাছ লাগাবেন। ২০০-২৫০ একর নতুন আবাদি ক্ষেত্র যদি তিন বছরে করা যায় তাহলে তিন বছর পর থেকে ওই নতুন প্ল্যান্টেশন এরিয়ায় পাতা আসবে, বাগান অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হবে, রুগ্‌ণ এবং বন্ধ বাগান ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াবে। তবে অমিতাংশুবাবুর যুক্তি, সে ক্ষেত্রে মালিকের সঙ্গে সরকারের চুক্তি হবে, মালিকপক্ষকে বকেয়া গ্র্যাচুইটি অথবা প্রভিডেন্ট ফান্ড অথবা পানীয় জল সমস্যা অথবা শ্রমিক আবাস অথবা সামাজিক স্বাস্থ্য খাতের যে কোনও ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে নিয়মিত।

অমিতাংশুবাবুর মতে, চা-শিল্পে

জলপাইগুড়ির বন্ধ চা নিলামকেন্দ্র

ধারাবাহিকভাবে প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করতে হয় এবং এটা ‘রুটিন ওয়ার্ক’। বদলে ঠিকঠাক বিনিয়োগ হলে এবং উৎপাদনে জোয়ার এলে ব্যাপক ‘রিটার্ন’ও পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় সরকারি নীতির প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে অমিতাংশুবাবুর যুক্তি, একটা চটের ব্যাগ বা প্যাকিং বক্সে বাগান থেকে তৈরি চা যখন বাজারে পৌঁছায়, তখন ব্যাগে বা প্যাকিং বক্সে কোম্পানির নাম, চায়ের পরিমাণ, ইনভয়েস নম্বর, প্যাকিং-এর তারিখ ইত্যাদি তথ্য দেওয়া থাকে। কিন্তু একটাও বাক্সে বা ব্যাগে দাম লেখা থাকে না কেন? অর্থাৎ উৎপাদন খরচের নিরিখে ‘মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস’ও লেখা থাকে না। যে শিল্প কোটি কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে, যে শিল্পে হাজার হাজার শ্রমিক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল, যে শিল্প উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ শিল্প, সেই শিল্প এতটাই অবহেলিত যে, মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইসটুকু পর্যন্ত আমরা ঠিক করে দিতে পারছি না। অমিতাংশুবাবুর মতে, ভারত সরকার দ্বারা নিযুক্ত টি বোর্ড বা চা পর্ষদ আছে চায়ের এবং চা-শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনদের স্বার্থ দেখার জন্য। চায়ের গুণগতমান বৃদ্ধি, চা-শিল্পে গবেষণার সুযোগ সম্প্রসারিত করা, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা, ভরতুকির বিষয়গুলো, যেমন ভরতুকিযুক্ত ধান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা টি বোর্ডের অন্যতম প্রধান কাজ। লোনের জন্য কেউ আবেদন করলে টি বোর্ড বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে বাগানটির জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধাগুলো বরাদ্দ করতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে মালিককে প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি নিয়মমতো দেওয়া সুনিশ্চিত করতে হবে। অমিতাংশুবাবুর যুক্তি, ক’টি বাগান আছে, যেগুলো রুগ্‌ণ নয়? ক’টি বাগান আছে, যাদের সবকিছুই টি বোর্ড নির্দেশিত নিয়মের মতো ঠিকঠাক? ফলত, কেন্দ্রীয় ভরতুকি আসা প্রয়োজন রুগ্‌ণ শিল্পের ক্ষেত্রেই। রুগ্‌ণ বাগানগুলো যাতে সহায়তা লাভ করে আর্থিকভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তার জন্যই কেন্দ্রীয় ভরতুকি। তাহলে লাভটা হচ্ছে কাদের? কেন্দ্রীয় সরকারের আইনকানুন, নীতিনিয়ম অনেক সরলীকরণ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন অমিতাংশুবাবু। তাঁর মতে, সমীক্ষা প্রয়োজন র‍্যানডম হারে। দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা চা-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অথচ আজ পর্যন্ত কোনও সরকারই তাঁদের মতামত নেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি বলে আক্ষেপ অমিতাংশুবাবুর। তিনি মনে করেন, দীর্ঘসূত্রিতা, গঠনমূলক চিন্তাভাবনার অভাব, শ্রম দিবসের কার্যকর ব্যবহারে ঘাটতি, ওয়ার্ক কালচার, অলসতা, ফাঁকিবাজি চা-শিল্পের বন্ধ্যা দশার মূল কয়েকটি কারণ।

আইটিপিএ সচিব মনে করেন, শ্রমিকদের পেশাগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা, শ্রমিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, নতুন নতুন উৎপাদন পদ্ধতি এবং নিয়মকানুনের সঙ্গে শ্রমিকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত জরুরি। ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য বুঝিয়ে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। সঠিক প্রশিক্ষণ এবং কাজ করার পরিবেশ না থাকলে স্বভাব অলসতা থেকেই শ্রমিকরা কর্মবিমুখ হবেন। শ্রমিকদেরকে বুঝতে হবে, বাগানের মূল ম্যানেজমেন্ট পাঁচজন, কিন্তু তাঁরা সম্মিলিতভাবে অন্তত হাজার। তাই বাগানের ভালমন্দের সঙ্গে সকলেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত হলে এর থেকে ভাল কিছু হতে পারে না। কারণ বংশপরম্পরায় শ্রমিকরা একই বাগানে কাজ করবেন। ফলে বাগানের ভালমন্দ, সুখ-দুঃখের সঙ্গে শ্রমিকরাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে অমিতাংশুবাবু মনে করেন। কারণ তাঁর মতে, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, কেনিয়া যদি আন্তর্জাতিক স্তরে গুণগতমানসমৃদ্ধ চা উৎপাদন করতে পারে তাহলে তারা তো আমাদের দেখেই শিখেছে? চায়ের বিভিন্ন লাভজনক দিক অনুসন্ধান করেছে, নিরীক্ষণ করেছে, চা-শিল্পের ফাঁকফোকরগুলো ভরাট করে তাদের দেশে শিল্পকে এমনভাবে সাজিয়েছে এবং সরকারি সহযোগিতা ওসব দেশ এতটাই পাচ্ছে যে, চায়ের উৎপাদন খরচ অনেক কমে যাচ্ছে। ভারতীয় চায়ের বর্ধিত দাম এবং গুণগতমান বিদেশি ক্রেতাদের ভারতীয় চায়ের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করছে। এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।

২০১৭ সাল ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টারস’ অ্যাসোসিয়েশন-এর ডায়মন্ড জুবিলি। ১০০ বছর চা-শিল্পকে নেতৃত্ব দেওয়া সাধারণ কথা নয়। সেই প্রতিষ্ঠানের ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক এবং বাগিচা মালিকদের উত্তরবঙ্গীয় কমিটির মুখ্য উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী আশাবাদী, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চা-শিল্প পুনরায় লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। মালিক, শ্রমিক সকলের মুখেই হাসি ফুটবে।

চা-শিল্প সমস্যা সংকট ও সমাধান বিষয়ক এই আলোচনায় অমিতাংশু চক্রবর্তী কয়েকটি বিশেষ দিক চিহ্নিতকরণ করেছেন—

১) শিল্পে অগ্রগতি আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের, বিশেষত টি বোর্ডের বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

২) মালিকদের ন্যূনতম মুনাফা না হলে তাঁরা চা-শিল্পে আগ্রহী হবেন না। ফলে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

৩) বাগানে উপযুক্ত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, ইন্টারনেটে পরিষেবা ইত্যাদির আশু ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কারণ শ্রমিককে কোনও ম্যানেজমেন্টই কাজ বাদ দিয়ে মজুরি আনতে ব্যাঙ্কে যেতে দিতে চাইবে না।

দ্রব্যমূল্যের নিরিখে শ্রমিকদের মজুরির দাবিকে নীতিগতভাবে সমর্থন করে তিনি বলেন, পত্রপত্রিকা, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, সমাজকর্মীরা, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, চা-বাগিচায় যাঁরা কাজ করছেন— সকলেই শ্রমিক-কর্মচারীদের দীর্ঘ বাগান বন্ধ হওয়াজনিত কষ্টের দিকে দৃকপাত করছেন। কিন্তু শ্রমিকরা প্রকৃতপক্ষে ভুখা কি না, সে নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। ডুয়ার্সের অধিকাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যেগুলো চা-বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চলে, সেগুলো ছাত্রছাত্রীদের অভাবে চালানো যাচ্ছে না। এগুলো অধিকাংশই অবহেলিত। অথচ যে কোনও চা-বাগিচায় লক্ষ করলে দেখা যাবে, এমনকি কিছু কিছু বন্ধ চা-বাগানেও বাগানের গাড়ি ভরতি করে টাইওয়ালা জামা-প্যান্ট পরে শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েরা পার্শ্ববর্তী উচ্চবেতনের ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়তে যাচ্ছে। একটু নজর করলেই দেখা যাবে, বন্ধ-খোলা অধিকাংশ চা-বাগিচার প্রায় প্রত্যেকটা ভাঙাচোরা শ্রমিক পরিবারের আবাসের ছাদে ডিশ অ্যান্টেনা। প্রায় প্রতি পাঁচটি বা দশটি শ্রমিক পরিবারপিছু একটি করে মোটরবাইক। মোবাইল তো প্রত্যেক শ্রমিক পরিবারের ঘরে ঘরে।

২০১৭ সাল ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টারস’ অ্যাসোসিয়েশন-এর ডায়মন্ড জুবিলি। ১০০ বছর চা-শিল্পকে নেতৃত্ব দেওয়া সাধারণ কথা নয়। সেই প্রতিষ্ঠানের ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক এবং বাগিচা মালিকদের উত্তরবঙ্গীয় কমিটির মুখ্য উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী আশাবাদী, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চা-শিল্প পুনরায় লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। মালিক, শ্রমিক সকলের মুখেই হাসি ফুটবে। বাগানে বাগানে শোনা যাবে দ্রিমি দ্রিমি ধামসা মাদলের শব্দ।

দেবপ্রসাদ রায়

ক্যাম্প নিয়ে মেতে রয়েছেন লেখক। কিন্তু ভারতের মতো বহু ভাষা-সংস্কৃতির দেশে কাজ করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। তিন নম্বর ক্যাম্পের সময় সেটা বোঝা গেল। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন? লেখক বাংলার মানুষ, কিন্তু নিরপেক্ষতা প্রমাণের জন্য তিনি ফুটবল মাঠে বাংলার বিপক্ষে গোলে দাঁড়ালেন। নর্থ-ইস্টের ছেলেদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা আদায় করে ক্যাম্প সফল করার জন্য লেখকের গোলকিপার হওয়ার দরকার কেন হল? বহুলপঠিত এই ধারাবাহিকের বর্তমান কিস্তিতে সেই জবাবটাই মিলবে এবার।

।।৩৪।।

প্রশিক্ষণজনিত কাজের পরিসরটা ক্রমশ বাড়তে শুরু করেছিল। কারণ তখন একদিকে ক্যাম্পে ছেলেরা, অন্য দিকে মাঠে ক্যাম্পের ছেলেরা। ওদের ইয়ুথ কোঅর্ডিনেটর বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

প্রতিটি ক্যাম্পের মাঝে এক-দেড় মাসের ব্যবধান থাকত। নতুনভাবে পাঠক্রম তৈরি করবার জন্য এই সময়ের প্রয়োজন ছিল। কারণ ম্যাক্রো লেভেল ইস্যুগুলো বদলাত না, কিন্তু মাইক্রো লেভেল ইস্যুগুলো বদলাত। সেইভাবে ফ্যাকাল্টিতেও পরিবর্তন আনতে হত। তা ছাড়া যে রাজ্যে দল ক্ষমতায় আর যেখানে ক্ষমতায় নেই, দুই জায়গার প্রয়োগ প্রক্রিয়া এক হতে পারে না। আমার নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্ব দেখে স্টিফেন সাহেব খুব প্রভাবিত হয়েছিলেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন, কেবল যুব নয়, যাঁরা পরিণত বয়সের, মূল সংগঠনে আছেন, তাঁদেরও ট্রেনিং দরকার। কারণ দলের অধিকাংশ লোকই কোনও গভীর বিষয় নিয়ে পড়াশোনা বা আলোচনা করে না। তাই তাদেরও একটা অন্তত ওরিয়েন্টেশন হওয়া দরকার।

তারও ব্লু-প্রিন্ট আমাকে তৈরি করতে হল। এবং ২য় এবং ৩য় ক্যাম্পের মাঝখানে সে শিবির (সাত দিনের) শুরুও হল।

আমাদের ছেলেদের কী প্রভাব পড়েছে দলের ভিতর তা বুঝতে পারা গেল, যখন হিমাচলের রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি জ্ঞানচাঁদ টুডু তীব্র ভাষায় কোঅর্ডিনেটরদের বিরুদ্ধে বলতে শুরু করলেন। আমি তখন ট্রেনিং প্রোগ্রামের অফিস ৫ নং রাইসিনা রোডে ছিলাম। ওখান থেকে মালবিন্দার ফোন করল। ও আমার মনিটরিং সেল দেখত এবং ওখানে কাজ সামলানোর জন্য পাঠানো হয়েছিল। ফোনে বলল, তোমার ছেলেদের নামে ভীষণ অভিযোগ হচ্ছে। আমি রাজ্য ও জেলার নাম জেনে নিলাম। তারপর সেই জেলার প্রকৃত তথ্য ছেলেরা কী পাঠিয়েছে তা বগলদাবা করে নিয়ে ভেনুতে পৌঁছে রাজীবজিকে নম্রভাবে বললাম, অভিযোগ এখানেও আছে, কীভাবে দলের নেতারা, টুডু সাহেবরা অসহযোগিতা করছে, তার বিবরণও ছেলেরা পাঠিয়েছে। তখন রাজীবজি আমার দেওয়া রিপোর্টটা পড়লেন, তারপর ক্ষোভে ফেটে পড়লেন, 'আমি একটা পরীক্ষমূলক উদ্যোগ নিয়েছি, আর আপনারা সে কাজ যাতে সফল না হয়, তার চেষ্টা করে যাচ্ছেন? এই তো টুডু সাহেব, আপনি আপনার জেলায় ছেলেদের হয়রানির শিকার হতে বাধ্য করেছেন, তার বিবরণও আছে। পড়ব?' সভাগৃহ নিস্তব্ধ। এবং 'গ্রামে গ্রামে এই বার্তা রটে গেল ক্রমে'-র মতো এটা প্রচার হতে বেশি সময় লাগল না, এরা রাজীবজির নিয়োজিত 'হোলটাইমার', এদের পিছনে লেগে লাভ হবে না। বরং সাহায্য করলেই ভাল। কারণ সেটাও তো ছেলেরা রাজীবজিকে জানাবে।

নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে এই দিনগুলো কেটেছে। প্রথম ক্যাম্পে তাঁবুতে শুতাম। একদিন মাঝরাতে পাশ ফিরে শুতে গিয়ে দেখি আমার পাশে আর-একটি লোক শুয়ে আছে। ঘটনার আকস্মিকতায় বুদ্ধি না হারিয়ে আস্তে করে বেরিয়ে এসে এপাশের তাঁবু থেকে রাজ্যগুলোর ইনচার্জদের ডেকেছি। ওরা হইহই করে আসাতে সে ব্যাটা বিছানা খালি করে চম্পট দিয়েছে। কিন্তু অভিযান থামবে কেন? চারদিকে খুঁজে বাগানের ঝোপের থেকে তাকে পাওয়া

গেল। একটা মাতাল। উত্তম-মধ্যম দিয়ে তাকে পুলিশ ডেকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হল।

দুটো ক্যাম্প হওয়ার পর বুঝতে পারছিলাম, ছেলেরা যে মাঠে নামতে প্রস্তুতি নিচ্ছে, তার পিছনে কী পড়ানো হত যত না কাজ করছে, কার জন্য করছে, তা অনেক বেশি কাজ করছে। মাথার উপর রাজীবজির হাত আছে— এটা যখন তারা বুঝতে পারত, তখন কোনও ঝুঁকি নিতেই ওদের কোনও সংশয় থাকত না। আর আমাকে ওরা রাজীবজি ও ওদের মাঝে সম্পর্ক ধরে রাখার একটা মাধ্যম হিসাবে ভাবতে শুরু করেছিল।

রাজীবজির সঙ্গে তখন নিয়ম করে দশ দিন পরপর দেখা হত। এমন একটি দিনে উনি বললেন, 'ডিপি, তোমাকে বলেছিলাম, একটা ক্যাম্প ম্যাডাম বোলারকে দিয়ে করিয়েছ, আর-একটা ক্যাম্প আর কোনও পেশাদারের সাহায্য নিয়ে করে দেখো তুলনামূলকভাবে কে ভাল করছে। এখন উলটে উনিই আমায় বলে গেলেন, ডিপি-র বদলে অন্য কাউকে দিন, দলের সকলেরই তো এ ব্যাপারে একটা অভিজ্ঞতা থাকা উচিত।' আমি বললাম, 'আপনি যা বলবেন তা-ই হবে। আমি অন্য কোনও কাজ দিলেও একই আগ্রহ নিয়ে করব।' রাজীবজি বললেন, 'না, তুমিই করবে, কিন্তু বোলারের বদলে এবার পেশাদার হিসাবে অন্য কাউকে দেখো।' কাজটা সহজ ছিল না, কারণ হিউম্যান এলিমেন্ট নিয়ে কাজ করা মানুষ খুব বেশি পাওয়া যেত না। তবে ইতিমধ্যে আমার বেশ কিছু পেশাদার প্রশিক্ষকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাওয়াতে, আমি শেষ পর্যন্ত দিল্লি ইউনিভার্সিটি থেকে সিপি ঠাকুর সাহেবকে খুঁজে বার করলাম। আমাকে মন দিয়ে শুনে উনি বললেন, 'আমি রাজি, তবে একটা শর্তে।' আমি তো যে কোনও শর্তেই রাজি। বললাম, 'বলুন স্যার। আশা করি হ্যাঁ বলতে অসুবিধা হবে না।' ওঁর শর্ত শুনে আমি একটু অবাকই হলাম। উনি বললেন, 'তুমি এত ভাল একটা কাজ করছ এবং তাতে আমাকে সঙ্গী করতে চাইছ, যা আমাকে রাজীব গান্ধির পাশে দাঁড়াবার সুযোগ করে দেবে, আমি সে কাজে কোনও পারিশ্রমিক নেব না।' সত্যিই তিনি নেননি। কিন্তু রাজীবজি যা দিয়েছিলেন, তিনি ভাবতেও পারেননি। বিহার থেকে রাজ্যসভায় নিয়ে এসেছিলেন।

তৃতীয় ক্যাম্পটা ছিল সবচেয়ে কঠিন এবং ছেলেরা উত্তর-পূর্ব ভারতের, আর তার ভিতরই বেঙ্গল ঢুকে আছে। আমি বাঙালি। তাই আমার নিরপেক্ষতা নিয়ে পদে পদে প্রশ্ন উঠবে— আমি জানতাম। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শুরু করলাম। নাগা, মিজো, মণিপুরি, খাসি, গাড়ো, ত্রিপুরি, অরুণাচলিদের বিচিত্র সমাবেশ— আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিল। কারণ এদের নিয়মশৃঙ্খলা মানানোর অর্থ, মদ খেতে দেওয়া যাবে না, যা কিনা আমাকে জল খেতে মানা করার মতো। বাইরে গেলে সময়ে ফিরে আসতে হবে। একদিনও ছুটি নেওয়া চলবে না। এবং ভাষার সমস্যা। তবুও প্রায় সকলেই অসমিয়াটা মোটামুটি বুঝত বলে এবং আমি এই ভাষাটায় কাজ চালিয়ে নিতে পারি বলে কোনওরকমে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছিলাম। তা-ও নানা পরীক্ষা দিয়ে।

একদিনের ঘটনা বলি। সকালবেলার ক্যান্টিনের ঠিকদার বলল, 'আমি আর কাজ করব না।' আমি বললাম, 'কেন?' বলল, 'সকালবেলায় আমার যে ছেলেটি বেড টি দিতে গিয়েছিল, গোলো সারিং তাকে মেরেছে।' গোলো ছিল অরুণাচলের এক অসম্ভব হট হেডেড। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'গোলো, তুমি এই ছেলেটাকে মারলে কেন?' গোলো নির্লিপ্তভাবে জবাব দিল, 'ও আমার গায়ে হাত দিয়ে আমায় ঘুম থেকে তুলেছে তাই মেরেছি।' আমি বুঝলাম, কথা বাড়ালে আমিই অসম্মানিত হব। কারণ ওর তেরিয়া জবাব এমনই একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। আমি চুপ করে গেলাম। কিন্তু হারলে চলবে না। কোনও একটা সমাধান বার করতেই হবে। শেষ পর্যন্ত রাতে আমি গোলোকে গিয়ে বললাম, 'গোলো, তুমিই ঠিক। তোমার গায়ে হাত দিয়ে ও অন্যায় করেছে। আমি ঠিক করেছি, কাল সকাল থেকে তোমাকে আমিই চা দেব। কোনও ভুল হবে না।' গোলো একদম ভেঙে পড়ল। বলল, 'দাদা, আজ তুমি দুপুরে খাওনি, আমি লক্ষ করেছি। আমিও খাইনি। এবং কাল সকালে তুমি শুনবে যে, ব্যাপারটা মিটে গিয়েছে।' পরদিন সকালে সেই ছেলেটিই নাচতে নাচতে আমায় এসে জানাল, 'গোলো স্যারনে মুঝে আজ দশ রুপিয়া দিয়া।' বুঝলাম, কাজ হয়েছে।

ম্যাডাম কিন্তু সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ক্যাম্পে থাকতেন। কারণ ওঁর এটা প্রফেশনাল অ্যাসাইনমেন্ট ছিল। কিন্তু ঠাকুর সাহেব দশটা-পাঁচটা কলেজে পড়াবার মতো আসতেন, চলে যেতেন। ওঁকে কিছু বলার ছিল না। কারণ উনি ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছেন।

এদিকে নানাভাবে চেষ্টার পরেও বোঝানো কঠিন ছিল যে, আমার বেঙ্গলের ছেলেদের প্রতি কোনও আলাদা দুর্বলতা নেই। কারণ ওরা ফাঁক পেলেই আমার সঙ্গে এসে গল্প করত বা ক্লাসে ভাষার সমস্যায় যেটা বুঝতে পারেনি, কেউ কেউ সেটাও বুঝতে আসত।

আগের দুটো শিবিরে রাজ্যগুলো আলাদা হলেও একটা কালচারাল হোমোজিনিটি থাকার ফলে সন্ধেবেলায় নাচ-গান করে মাতিয়ে রাখত। প্রথম ব্যাচে বলদেব বলে একটা পাঞ্জাবি ছেলে ছিল। ভাংরা নাচের বিশেষজ্ঞ। ওর কাছ থেকে সবাই বিকেলে ভাংরা শিখত, ফলে শিবিরে একটা 'ওয়াননেস' গড়ে তোলা গিয়েছিল। সাউথ নিয়েও অত সমস্যা হয়নি। কারণ কোনও কোনও তামিল ছিল, যারা তেলুগু বুঝত, কোনও কোনও মালয়ালি ছিল, যারা তামিল বুঝত। কিন্তু তৃতীয় ক্যাম্পে বাঙালি প্রশিক্ষণার্থী আর উত্তর-পূর্ব ভারতের ছেলেদের মধ্যে একটা পরিষ্কার বিভাজনরেখা কাজ করেছিল। আবার সংখ্যায় সবাই মিলে যতজন বাংলা ভাষাভাষী— অসম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ মিলে তারা অর্ধেকের চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। ফলে একটা চোরাস্রোত সবসময় ছিল, কে কী করে অপরকে জব্দ করবে।

একদিন ২৪, আকবর রোডে যাবার কথা ছিল। ছেলেরা ফুটবল খেলছে দেখে গেলাম। ঘণ্টা দুয়েক পরে ফিরে এসে শুনি, বেঙ্গলের সঙ্গে বাকিদের খেলা নিয়ে হাতাহাতি হয়েছে। আমি শিউরে উঠলাম। এ খবর বাইরে গেলে কী হবে! যদিও কোনও শিবিরেই কোনও সাংবাদিকের প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু আমি এটাকেও চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলাম।

আমি বললাম, 'কাল আবার ম্যাচ হবে। বাংলার বিরুদ্ধে আমি গোলে খেলব।' ঝুঁকি ছিল, গোল খেলে বলবে ইচ্ছে করে হারিয়ে দিল। প্রাণপণে খেলে তিন গোলে দলকে জিতিয়ে প্রমাণ করলাম, আমি সবার, শুধু বাংলার নই।

(ক্রমশ)

সংশোধন

১৫ মে সংখ্যার কিস্তিতে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে অনিচ্ছাকৃত একটি লাইন বাদ গিয়েছে যার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। অনুচ্ছেদটি আবার ছাপা হল—

তখন রাজ্যে নেতাদের যে স্তর ছিল, তাতে এক নম্বরে ছিলেন বরকতদা, দুইয়ে প্রণবদা, তিনে সাত্তার সাহেব। তারপর আর কোনও অর্ডার নেই, যে যখন পাচ্ছে, নিজেকে উপরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তাই রেষারেষিও ছিল প্রবল। রাজ্যের গোষ্ঠী লড়াইয়ের প্রভাব জেলাতেও পড়ছিল, কারণ ইতিমধ্যে ইন্দিরা গান্ধিকে যাঁদের পরিত্যাজ্য বলে মনে হয়েছিল, '৮০-এর পর তারা সবাই মূলস্রোতে এসে গিয়েছেন, এবং গোষ্ঠী রাজনীতিকে আরও প্রকট করে তুলেছেন।

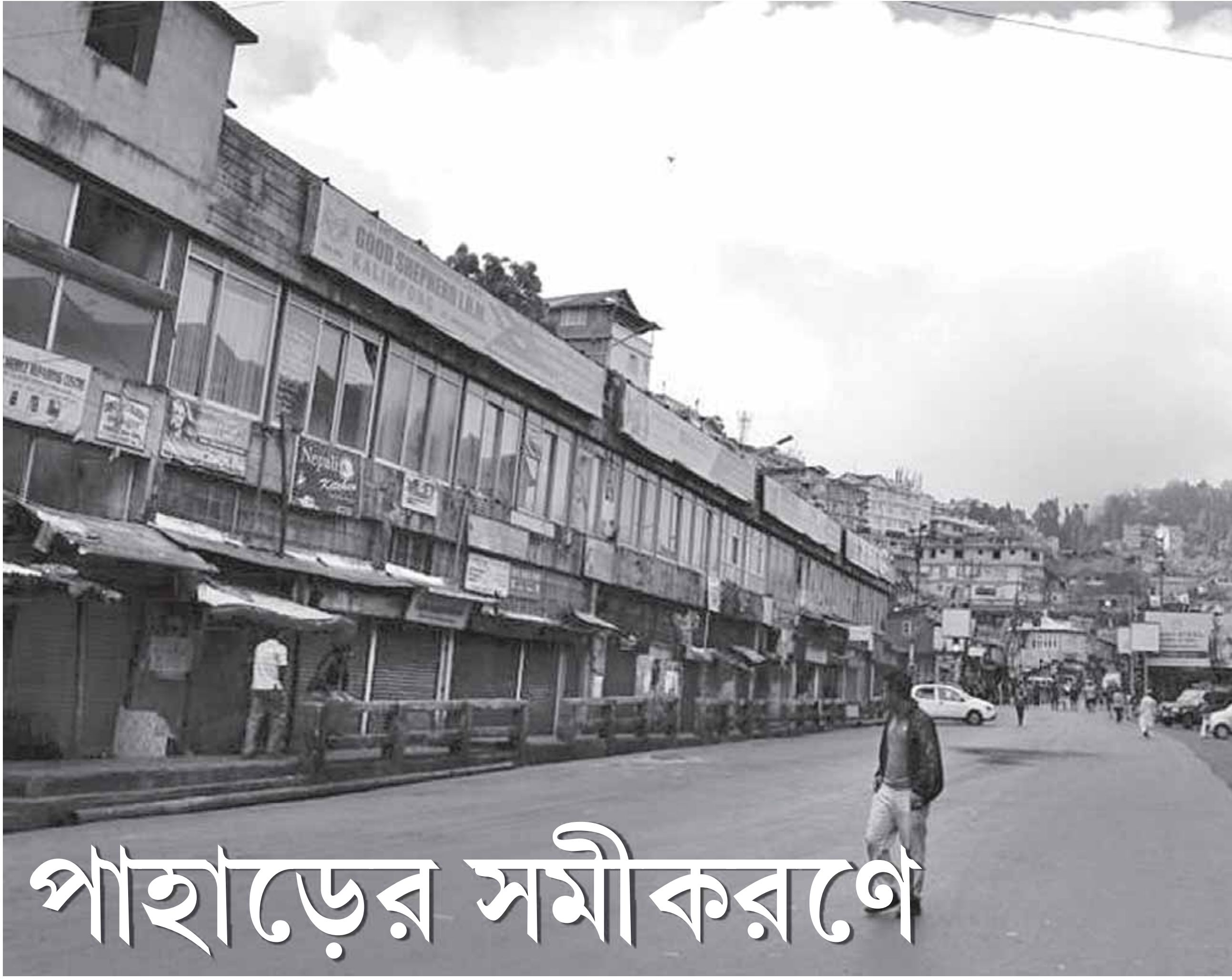

পাহাড়ের সমীকরণে কি কোনও ছোটখাটো ভুল ধরা পড়ল?

পাহাড়ে ডাকা বন্ধ বছর কয়েক আগেই হাস্যকর জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল। বন্ধের সময় পাহাড়ের যে কোনও জায়গায় যেতে চাইলে মোর্চার যে কোনও অফিসে ঢুকে সাদা কাগজে দু'লাইন ইংরাজিতে লিখে দিলেই সে আবেদন পত্রের ওপর এন্ট্রি পাসের সীলমোহর দিয়ে দিতেন দায়িত্বপ্রাপ্ত মোর্চাকর্মী। এবার সেই কাগজই হত বন্ধের পাহাড়ে আপনার অবাধ চলাফেরার পাস। দোকানপাট সবই বন্ধ, কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে কিছু চাইলেই তা মিলে যেত। এমনকি হোটেলের ঘরও। মোর্চাকর্মীদের এতে আপত্তির কিছু ছিল না। কারণ তখন কলকাতার মিডিয়ায় ব্রেকিং নিউজ চলছে, পাহাড়ে জনজীবন স্তব্ধ। অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্য সফল। দার্জিলিং-কালিম্পং-এর বেশিরভাগ হোটেলই বহিরাগতদের লিজ নেওয়া। অতএব সেসব হোটেল দিনের পর দিন বন্ধ থাকলেও তাদের কোনও মাথাব্যাথা ছিল না।

এরপর স্বভাবতই মানুষের বিরক্তি বাড়তে শুরু করল। দোকানিরা হতাশ হয়ে বন্ধ সমর্থকদের মা-বোন তুলে গালিগালাজ করতে লাগল প্রকাশ্যেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সবার মনেই কমবেশি কাজ করত ভয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাফ অ্যান্ড টাফ' শাসননীতির গোড়ায় নিন্দুকরা মুখ বেঁকিয়ে হাসলেও বাংলার পাহাড়ের আকাশে বহুদিন পরে নতুন সূর্য উঠল। মোর্চা তথা গুরুং ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়তে থাকল, যা একসময় তাঁর অস্তিত্বের সংকট হয়ে দেখা দিল। এমতাবস্থায় কয়েক বছর বাদে পাহাড়ে হঠাৎ করেই আবার হিংসার আগুনে, বন্ধের ছায়ায় হতবাক সবাই। যতই একে গুরুঙের মরীয়া প্রয়াস বলে ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, অভিজ্ঞ রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, পাহাড়কে শান্ত-অনুগত করতে যে নীতির অবলম্বন করেছিলেন বাংলার নতুন সরকার সেই সমীকরণে কোনও ফাঁক থেকে গিয়েছিল কি? কোনও ছোটখাটো ভুল? কোনও আপাত ক্ষুদ্র ইস্যুকে গুরুত্ব না দেওয়া? পুরো বিষয়টা সাধারণ মানুষের চোখে বিশ্লেষণ করলে সেরকমই মনে হওয়া কিন্তু অস্বাভাবিক নয়।

এক। অনেকেই পাহাড়ে অভিমত ব্যক্ত করছেন, এই হিংসা বোধহয় অনিবার্য ছিল। কারণ মমতার বিধ্বংসী নীতিতে মোর্চার দলে ভাঙন ধরেছিল, কমে যাচ্ছিল নরমপন্থীদের সংখ্যা। ফলে শক্ত হচ্ছিল চরমপন্থী লবি, যারা প্রথম থেকেই কোনওরকম

মন্ত্রীসভার বৈঠক চলাকালীন যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটল তাকে ‘সুপরিকল্পিত আক্রমণ’ ছাড়া ‘জনরোষ’ বা ‘হঠাৎ মারমুখী’ জাতীয় কিছু বলা যায় না। যে আক্রমণের ছক কষা হয়েছে অনেক আগে থেকেই ঠান্ডা মাথায়, যা এর আগে মোর্চার আন্দোলনে খুব একটা দেখা যায়নি।

আপসনীতিতে যেতে রাজি ছিল না। সেই ঘিসিংয়ের আমল থেকেই তারা ‘সশস্ত্র আন্দোলনে’র পক্ষে ছিল, কিন্তু সরকারি অর্থ ও আনুকূল্যের লোভে দলে স্বার্থান্বেষী নরমপন্থীদের দাপট, ফলে দলের মধ্যে সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছিল তারা। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, এই চরমপন্থীরা এতটাই দিনে দিনে মরীয়া হয়ে উঠেছিল যে ‘বাইরে থেকে’ অস্ত্র আনার পরিকল্পনা হয়েছে বহুবার। দু’একবার ভেস্তে গিয়েছে, পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে একাধিকবার, যা খবরে বিক্ষিপ্ত ঘটনা হিসেবে চেপে যাওয়া হয়েছে বা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু সেসব পরিকল্পনা একবারও সফল হয়নি একথা কে জোর দিয়ে বলতে পারে? আজ চরমপন্থীরা দলে সংখ্যায় ভারী, অতএব এখন হিংসার অবির্ভাব যে বারবারই ঘটবে তা আন্দাজ করা যায়!

দুই। মন্ত্রীসভার বৈঠক চলাকালীন যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটল তাকে ‘সুপরিকল্পিত আক্রমণ’ ছাড়া ‘জনরোষ’ বা ‘হঠাৎ মারমুখী’ জাতীয় কিছু বলা যায় না। যে আক্রমণের ছক কষা হয়েছে অনেক আগে থেকেই ঠান্ডা মাথায়, যা এর আগে মোর্চার আন্দোলনে খুব একটা দেখা যায়নি। মুখ্যমন্ত্রীসহ রাজ্যের তাবড় ভিভিআইপি রা যখন পাহাড়চূড়োয় তখন ‘তৎপর’ গোয়েন্দা বাহিনী এই আক্রমণের বিন্দুবিসর্গ আগাম আচ করতে পারল না এর থেকে আশচর্যের কিছু হতে পারে? এর একটাই ব্যাখ্যা যৌক্তিক মনে হয়, বাইরের কোনও জঙ্গি সংগঠন এর মধ্যেই মোর্চার চরমপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মেলায় নি তো? যাদের মস্তিক প্রসূত পরিকল্পনায় ঘটল এই হিংসা?

তিন। খবরে প্রকাশ, এই হিংসাত্মক তাণ্ডব চলার সময় পুলিশবাহিনীর একাংশ ‘প্রায় নিষ্ক্রিয়’ ছিল। অর্থাৎ পুলিশবাহিনীর একটা অংশ (ধরেই নেওয়া যাক তাদের বেশিরভাগই পাহাড়ি) পরোক্ষে সমর্থন করেছে গুরুঙের নেতৃত্বে এই আক্রমণ/তাণ্ডব/আন্দোলন! কিন্তু তার কারণটা কী? তারা কি এখনও তবে মোর্চার সমর্থক? নাকি তারাও মনে প্রাণে চাইছে না সমতলের শাসকদের এত দাপাদাপি? ‘কলকাতার কাপ্তানি’ যে কোনও পরিস্থিতিতেই যে পাহাড়বাসীর না-পসন্দ এই নিষ্ক্রিয়তা কি তারই প্রতীকী ভাষা? উত্তর যাই হোক না কেন, এর ভবিষ্যৎ যে সুখকর নয় তা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। কারণ পুলিশবাহিনীর সেই একাংশ এই আন্দোলনের খবর যে আগাম জানত সে নিয়ে নিশ্চয়ই কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না? কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারাও কি এই দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন? বা এড়িয়ে যেতে পারেন?

চার। মমতা সরকারের কৌশলী নীতিতে পাহাড় এখন দ্বিধাবিভক্ত, আমাদের সবারই জানা। নতুন জেলা গঠনের পর থেকে তিস্তার এপার আর ওপারের মানসিক দূরত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে, সাংস্কৃতিক ফারাক ভবিষ্যতে আরও প্রকট হয়ে দেখা দেবে সন্দেহ নেই। একটা সময় পাহাড়িরা ভুলেই যাবে যে পৃথিবীর চোখে বাংলার পুরো পাহাড়টার একটাই নাম ছিল— দার্জিলিং। সাম্প্রতিক পুর নির্বাচনে কালিম্পঙের ভোট বিশ্লেষণেই দেখা যায় মোর্চার শক্তি সেখানে কী হারে কমছে! যা আগামী দিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলেই মনে করে কালিম্পঙের সাধারণ মানুষ। অথচ এবার দেখা গেল কালিম্পঙে প্রথম দিনের বন্ধ ছিল প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত। দার্জিলিং পাহাড়ের মতো মোর্চার ভয় এখানে কাজ করে না, তেমনই টানা বন্ধও এখানকার মানুষ বরদাস্ত করে না। কিন্তু মোর্চার ডাকা বন্ধ ব্যর্থ করতে রাস্তায় বের হল না জাপ-এর মতো বিরোধী দল, যার অর্থ নীরব সমর্থন। এর ব্যাখ্যা আবারও অতীব স্পষ্ট, ‘গোর্খাল্যান্ড’ দাবির প্রশ্নে কেউ কারও বিরোধী নয়, স্বার্থের প্রশ্নে যতই বিরোধ থাকুক না কেন। অভিজ্ঞ ধুরন্ধর পাহাড়ি নেতারা খুব ভাল করেই জানেন মমতা পাহাড়ে এসে যতই ‘বাংলা ভাগ হতে দেব না’, ‘গোর্খাল্যান্ড হতে দেব না’ বলে হুংকার দেবেন তাতে সমতলের সমর্থন বাড়বে ঠিকই কিন্তু পাহাড়ি মানুষের ‘গোর্খাল্যান্ড’ আবেগ ততই জোরদার হবে। পাহাড় ও সমতলের মানুষের সেন্টিমেন্টে যত বিরোধ বাড়বে আখেরে তত লাভ সেই সব নেতাদেরই।

পাঁচ। আমরা সবাই বুঝি এখন গুরুং বা মোর্চা মানে গোটা পাহাড় নয়। একটা সময় সমগ্র পাহাড়ি আবেগের একক প্রতিনিধিত্ব

আমরা সবাই বুঝি এখন গুরুং বা মোর্চা মানে গোটা পাহাড় নয়। একটা সময় সমগ্র পাহাড়ি আবেগের একক প্রতিনিধিত্ব করত যারা, তারা এখন কেবল অস্তিত্ব রক্ষায় মরীয়া এক সংগঠন।

করত যারা, তারা এখন কেবল অস্তিত্ব রক্ষায় মরীয়া এক সংগঠন। রাজনীতির খেল বলে একেই! কিন্তু পাহাড়ে ঘুরলে বোঝা যায় আজও 'গোর্খাল্যান্ড' স্বপ্ন পাহাড়বাসীর হৃদয়ের কোণে সযত্নে লুকিয়ে আছে; যদিও কবে আসবে কীভাবে আসবে কাদের চেষ্টায় আসবে সেসব তারা জানে না, ভাবতেও চায় না। তারা কেবল এটুকু বোঝে, সমতলের কিছু মানুষের জন্য সেই স্বপ্ন সত্যি হতে পারছে না। সেই জন্যই বোধহয় হাজার প্রতিশ্রুতি মেলা সত্ত্বেও সমতলের কোনও দলের সঙ্গে গাটছড়া বাঁধতে সাহস করেন না হরকা বাহাদুর সাহেব। আর আমরা যতই বলি না কেন, পাহাড়ি হৃদয়ের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মোর্চার বিকল্প এখনও তৈরি হয়নি।

ছয়। উন্নয়নের তাস খেলে পাহাড়ে পা রাখতে চাইছেন বাংলার শাসক দল, তাতে আপত্তি নেই পাহাড়িদেরও। কিন্তু তার জন্য চাই গুরুং-বিকল্প বিশ্বস্ত পাহাড়ি মুখ। যাঁর ওপর আস্থা রাখতে পারবে আম পাহাড়ি জনতা, যাঁকে টপকাতে হবে গুরুং ও হরকার প্রাচীর, যাঁকে মুখে অষ্টপ্রহর জপতে হবে গোর্খাল্যান্ড-এর নাম। সবাই এখন জানি রামনাম-এর মতোই 'গোর্খাল্যান্ড' জপলেই গোর্খাল্যান্ড এসে হাজির হবে না। এবং মমতা খুব ভাল করেই জানেন আর যেই হোক অরূপ বা অভিষেক সেই মুখ হতে পারে না কখনই। কিন্তু এও তিনি সম্যক জানেন, বা এই কয়েকদিনের ঘটনাবলীতে নিশ্চয়ই অনুধাবন করেছেন, যা কিছু করবার তাঁকে চটপট সারতে হবে, গুরুংকে ক্ষমতায় খর্ব করতে হবে অতি দ্রুত, ফের ডালপালা গজিয়ে ওঠার আগেই।

সাত। পাহাড়ে যারা অনেকদিন ধরে রাজনীতি করেছেন, এখন অবসরের আড়ালে চলে গিয়েছেন, তাঁদের অনেকের অভিমত অন্যরকম। গুরুং সাম্প্রতিক 'ধামাকা' ঘটালেন স্রেফ একটা এক্সপেরিমেন্ট হিসাবে। হঠাৎ করেই সম্ভবত তাঁর মনে হয়েছে, 'বিমল গুরুং' নামে সমতলের জনমানসে যে জুজু কাজ করত সেটা ফিকে হয়ে যাচ্ছে, যা তাঁর ভবিষ্যতের পক্ষে খারাপ। কারণ তিনি নিজেও জানেন রাজনীতির প্যাঁচ কষা তাঁর খুব একটা আসে না, একজন উগ্র আন্দোলনকারী হিসাবেই তিনি নিজের ইমেজ রাখতে পছন্দ করেন। তাঁর ভয়েই একটা সময় সিপিএমের ছোটবড় কোনও নেতাই পাহাড়ে আসার কথা ভাবতে পারতেন না।

> ইদানিং মমতার পিছু পিছু কলকাতার বড়-মেজো-চুনোপুটি সব নেতাই পাহাড়ে এসে ভিড় জমাচ্ছিলেন 'নন্দনকানন' ভেবে। এদিক-ওদিক টুকটাক 'আমদানি'র পথও বের করে ফেলেছিলেন কেউ কেউ, পথেঘাটে বাজারে সক্রিয় হয়ে নেমে পড়েছিল তাঁদের দালালরাও। গুরুংবাহিনী বিলক্ষণ টের পেয়েছিল, দু-চারটে ধামাকা না দিলে কলকাতার এই সব 'ক্যাচরা' দিনে দিনে আরও সাহসী হয়ে উঠবে, ক্রমে ভাগ বসাবে তাদের পাতেও।

ছবি: অতনু সরখেল

ইদানিং মমতার পিছু পিছু কলকাতার বড়-মেজো-চুনোপুটি সব নেতাই পাহাড়ে এসে ভিড় জমাচ্ছিলেন 'নন্দনকানন' ভেবে। এদিক-ওদিক টুকটাক 'আমদানি'র পথও বের করে ফেলেছিলেন কেউ কেউ, পথেঘাটে বাজারে সক্রিয় হয়ে নেমে পড়েছিল তাঁদের দালালরাও। গুরুংবাহিনী বিলক্ষণ টের পেয়েছিল, দু-চারটে ধামাকা না দিলে কলকাতার এই সব 'ক্যাচরা' দিনে দিনে আরও সাহসী হয়ে উঠবে, ক্রমে ভাগ বসাবে তাদের পাতেও। মমতার সঙ্গে দখলের লড়াই চলছে তবু মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু এই 'অবাঞ্ছিত'দের ভয় দেখিয়ে ভাগানো ছাড়া আর চলছিল না। বলাইবাহুল্য, বোতল বোমা ছোঁড়ার ওইসব ভিডিও দেখার পর (চাক্ষুস ছেড়ে দাও) চুনোপুটি বাদই দিলাম, হোমরাচোমরা ক'জন নেতা সাধ করে আবার কবে পাহাড়ের দিকে পা মাড়াবেন যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়।

সাময়িক এক্সপেরিমেন্ট হোক বা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, হিংসা কোনও পরিস্থিতিতেই মেনে নেওয়া যায় না, যত দ্রুত সম্ভব এই হিংসাকে বন্ধ করতে হবে। যে কোনও প্রশাসনেই এটাই প্রথম কথা। বিমল গুরুং-এর চরমপন্থী ফোর্স হয়ত প্ররোচনার পথেই আনতে চাইছে প্রশাসনকে। কিন্তু অতীতে জ্যোতিবাবুরা যে দমননীতির আশ্রয় নিয়ে পাহাড়ে সফল হয়েছিলেন, আজকের ইন্টারনেট বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যুগ হলে তাঁদের পার পাওয়া মুস্কিল ছিল। উপরন্তু হিংসার বীজ কিন্তু পাহাড় জুড়ে সুপ্ত থেকেই গিয়েছিল। অতএব এবার প্রশাসন তথা সরকারকে পা ফেলতে হবে অতি সাবধানে। সমীকরণে ভুল দেখা দিলে তার সংশোধন চাই চটপট। আর সবার ওপরে আছে সমঝোতা। মিডিয়া ও লোকচক্ষুর আড়ালে যে সমঝোতায় সক্রিয় হয়ে ওঠেন পাওয়ার ব্রোকাররা। বাইরের দেশের নাক গলানো আছে কি না, কেন্দ্র সরকারের অবস্থান কী, সবটাই আমাদের মতো সাধারণ মানুষের অজানা থেকে যায়। তা থাকুক, যেটুকু আমরা অনুধাবন করতে পারি তা হল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাতুর্য-দক্ষতা বাংলার পাহাড়ে আজ বোধহয় কিঞ্চিৎ পরীক্ষার মুখে দাঁড়িয়েছে। কৌশলী উৎকর্ষতায় তিনি হয়ত তাঁর নিজের জমানায় উৎরেও যাবেন সহজেই। কিন্তু পাহাড়ের এই সমস্যার আমূল সমাধান কি বাস্তবে আদৌ সম্ভব? আদপেই কোনও নেতা বা দল বা সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী তা চাইছেন কি? বরং সেই প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজা শুরু হোক সবার আগে।

উত্তরায়ণ সমাজদার

> মোর্চার ডাকা বন্ধ ব্যর্থ করতে রাস্তায় বের হল না জাপ-এর মতো বিরোধী দল, যার অর্থ নীরব সমর্থন। এর ব্যাখ্যা আবার অতীব স্পষ্ট, 'গোর্খাল্যান্ড' দাবীর প্রশ্নে কেউ কারও বিরোধী নয়, স্বার্থের প্রশ্নে যতই বিরোধ থাকুক না কেন।
>
> এই হিংসাত্মক তাণ্ডব চলার সময় পুলিশবাহিনীর একাংশ 'প্রায় নিষ্ক্রিয়' ছিল। অর্থাৎ পুলিশবাহিনীর একটা অংশ পরোক্ষে সমর্থন করেছে গুরুঙের নেতৃত্বে এই আক্রমণ/তাণ্ডব/আন্দোলন!

১১৯ বছর ধরে লাগাতার ম্যাচ খেলছে জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব

জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব চালু হয়েছিল ১৮৯৮ সালে। গোটা রাজ্যে এত পুরনো খেলাধুলোর ক্লাব গুটিকয়েক মাত্র। এই ক্লাব ইতিমধ্যে হেরিটেজ ক্লাবের তকমা পেয়ে গিয়েছে। স্থাপিত হওয়ার পর থেকে অবিভক্ত রাজশাহি ডিভিশনে ক্রীড়া চর্চার ক্ষেত্রে এই ক্লাব ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল।

১৮৯৮ সালের জলপাইগুড়ি শহরে ফাঁকা জমির অভাব ছিল না। উৎসাহী একদল যুবক সাড়ে তিন একর জমি লিজ নিয়ে ক্লাব

শুরু করেছিল। পাশেই বহমান তিস্তা। চারপাশ গাছগাছালিতে ভরা। মাঠের পুব দিকে নদীর কাছে কাঠের ক্লাবঘর বানিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন যুবকরা। খেলাধুলো আর সমাজসেবাই ছিল লক্ষ্য। ধীরে ধীরে শহরের চা-শিল্পপতিরা ক্লাবের সদস্য হতে শুরু করলেন। ক্লাবের উন্নতি হতে লাগল। এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন দু'জন শিল্পপতি— সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায় এবং সন্তোষকুমার ব্যানার্জি। এই দু'জন ক্লাবের যাবতীয় দায়িত্ব নিজেদের তত্ত্বাবধানে নিয়েছিলেন।

সতেন্দ্রপ্রসাদ রায়

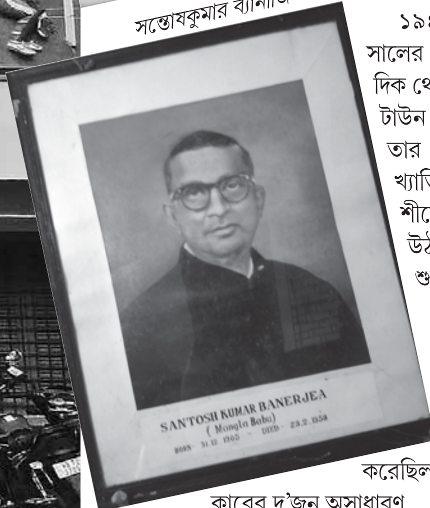

সন্তোষকুমার ব্যানার্জি

১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে উপযুক্ত ক্লাবের জন্য অনুদান ঘোষণার কথা জানানো হয়। টাউন ক্লাবের খাতায় সে বাবদ জমা পড়েছিল ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এর অর্ধেক ধরা হয়েছিল ১২০০ লোকের বসার উপযোগী গ্যালারি তৈরির জন্য। কিন্তু বাজারদর বেড়ে যাওয়ার কারণে ব্যয় অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

১৯৬৮-র বন্যায় ক্লাবের মাঠ ধ্বংস হয়ে যায়। সে সময় মাঠে পা রাখা যেত না। রাজ্যের গভর্নর ধরমবীর তাঁর তহবিল থেকে ১ লক্ষ ৬০ টাকা ক্লাবের জন্য মঞ্জুর করেন। ফলে ৩৫০০ লোক বসার উপযোগী আরেকটি স্টেডিয়াম ব্লক তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল। এর পর থেকে ফুটবল-ক্রিকেটের পাশাপাশি অন্যান্য খেলাধুলোর দিকেও সদস্যরা মনোযোগ দিতে পেরেছিলেন। ১৯৪০ সালের শেষ দিক থেকে টাউন ক্লাব তার খ্যাতির শীর্ষে উঠতে শুরু করেছিল।

ক্লাবের দু'জন অসাধারণ খেলোয়াড় ছিলেন রুনু গুহঠাকুরতা এবং মণিলাল ঘটক। দু'জনেই প্রয়াত। রুনুবাবু মোহনবাগানে খেলেছিলেন। দেশের হয়ে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকেও খেলেছিলেন। মণিবাবু খেলেছিলেন ইস্ট বেঙ্গলে। তিনিও দেশের হয়ে খেলতে গিয়েছিলেন 'পুবের দেশ'গুলিতে। এর বাইরে একগুচ্ছ খেলোয়াড় এই ক্লাব থেকে বেরিয়েছিল, যারা কলকাতা ফুটবল লিগের স্বর্ণযুগে বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে খেলেছেন।

১৯৫৭ সালে আসামে বরদলৈ ট্রফি জিতেছিল ক্লাব। তার আগে আসামের বাইরের কোনও দল সে ট্রফি জেতেনি। ক্রিকেটে এই ক্লাব উঠতে শুরু করেছিল ১৯৬০-এর পর থেকে। ক্লাবে টেবিল টেনিস চালু হয় ১৯৮০ সালে।

মনে রাখতে হবে যে, টাউন ক্লাব অনেকদিন পর্যন্ত খ্যাতনামা ছিল 'ফুটবল ক্লাব' হিসেবে।

১৯৯৫ সালে সরকার থেকে ক্লাব ১২ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছিল ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য। অতঃপর সদস্যরা ব্যাডমিন্টন খেলার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে বেশ সাড়া পেতে শুরু করে। তখন দরকার হয় কাঠের পাটাতনওয়ালা কোর্টের। জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সাহায্য করা হয়। সাংসদ তহবিল থেকে মিনতি সেন ২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন নতুন স্টেডিয়ামের কাজ শেষ করার জন্য। ক্লাবকর্তারা প্রতিটি কাজ সুসম্পন্ন করতে সফল হওয়ায় টাউন ক্লাবের পরিচিত চেহারা বদলে যেতে থাকে।

তারপর একদিন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জেলা শহরের পথে হাঁটতে বেরিয়ে শতবর্ষ অতিক্রান্ত ক্লাবটির সামনে দাঁড়িয়ে বিস্মিত হন। তিনি সোজা ক্লাবে ঢুকে পড়েন এবং সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে বরাদ্দ করেন ৫০ লক্ষ টাকা। বলা বাহুল্য যে, টাউন ক্লাব এর প্রতিটি পয়সার সদ্ব্যবহার করেছে।

জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব তার শহরের অন্যতম গর্ব। এর মাঠ বহু রোমাঞ্চকর খেলার সাক্ষী। কয়েক বছর আগেও টাউন ক্লাব ছিল শহরের একমাত্র স্টেডিয়ামযুক্ত চারদিক ঘেরা ময়দান। এখন অবশ্য 'বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গন' হয়েছে। একশো বছরের বেশি সময় ধরে হাজার হাজার ক্রীড়াপ্রেমীকে আনন্দ দিয়েছে এই মাঠে অনুষ্ঠিত খেলাগুলি। প্রখ্যাত ফুটবলার সুকুমার সমাজপতি তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন যে, ছয়ের দশকে জলপাইগুড়িতে ভাল ফুটবল দেখতে কলেজের মেয়েরা দল বেঁধে মাঠে আসত।

ক্লাবের গোপিয়া মালীকে যোগ্য সম্মান দিয়েছে টাউন ক্লাব। মূল প্রবেশপথে যে গেটটি আছে, তার নাম 'গোপিয়া মালী গেট'।

দিন বদলে গিয়েছে। আজ ক্লাবের পুব দিকে তিস্তা আড়াল হয়ে গিয়েছে বাঁধের কারণে। শহরে আর ফাঁকা জমি নেই। মাঠ ঘিরে থাকা গাছেরাও অদৃশ্য। সেই শ্যামল ছায়া মাখা টাউন ক্লাব এখন সাজানো-গোছানো আধুনিক স্পোর্টস ক্লাব। তখন যুবক চা-শিল্পপতিরা ব্যবসার পাশাপাশি ক্লাবের মাঠে নেমে ফুটবলও খেলতেন। এখন ফুটবল খেলার আগ্রহে ভাটা। কালের নিয়মে তাই ইনডোর গেমের দিকে মন দিয়েছেন সদস্যরা।

কিন্তু কখনও কখনও ভাল ফুটবল ম্যাচ থাকলে যখন গ্যালারি ভরতি দর্শক হুল্লোড়ে মেতে ওঠেন, তখন কিছুক্ষণের জন্য হলেও অতীতে ফিরে যায় ক্লাব। আসলে দুটো ছোট গ্যালারিভরা মানুষ। সাইডলাইনের পাশে 'গ্রিন স্ট্যান্ড'-এর টিকিট কাটা দণ্ডায়মান আরও বেশি মানুষ এবং তাঁদের সরিয়ে কর্নার কিকের জন্য জায়গা বার করা ফুটবলার— এটাই ছিল ক্লাবের 'অপূর্ব অতীত'।

নব্বই মিনিট নয়, শতাধিক বছরের ফুটবল খেলছে জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব। শেষ বাঁশি বাজার কোনও প্রশ্নই নেই।

দূর্বাদল মজুমদার

পর্যটকের ডুয়ার্স

উত্তরের ঐতিহ্যময় জটিলেশ্বর মন্দির

কারও মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না। পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে উদ্বেগ আছে, কারওবা অসুস্থতা রয়েছে। সব হাজির জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি এলাকরার ঐতিহ্যমণ্ডিত মন্দির জটিলেশ্বরে। সেখানে পুজো দিয়ে মানত করে গাছে সুতো বাঁধলে বাবা জটিলেশ্বর নাকি মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। তাই উত্তরবঙ্গে জটিলেশ্বর মন্দির ঘিরে আগ্রহ বাড়ছে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের আগে এবারেও সেই ভিড় দেখা যায়। সেই অনুযায়ী সেখানে টুরিস্টদেরও ভিড় বাড়ছে। পর্যটকদের কথা চিন্তা করে সেখানে মন্দির আধুনিকরণের কাজে হাত দিয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ইতিহাস অধ্যাপক ড. আনন্দ গোপাল ঘোষ বলেন, ওই মন্দিরটি গুপ্ত যুগ ও পাল যুগের সময়কার। গুপ্ত সাম্রাজ্যের কোনও প্রান্তিক কেন্দ্র হয়ত একসময় ছিল তিস্তার অববাহিকা ধরে। মন্দিরের ভাস্কর্য, মূর্তির কাজকর্ম দেখলেই তেমন অনুমান করা যায়। তবে এলাকার গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, বহু যুগ আগে স্বপ্নাদেশে কোনও রাজা বাবা জটিলেশ্বরের কৃপায় একদিনের মধ্যে এই মন্দিরের সামনে বিরাট পুকুর কেটে ছিলেন। আর মন্দিরও একদিনের মধ্যেই তৈরি হয়। সেই মন্দির আর পুকুর ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে অনেক কথা প্রচলিত আছে। মন্দিরে মোট পাঁচটি মন্দির। শিব বা বাবা জটিলেশ্বর, লক্ষ্মী নারায়ণ, মা দুয়ারিকা, মা বটেশ্বরি ও মা কামাখ্যা মন্দির। তাছাড়া সিদ্ধিদাতা গণেশও রয়েছে। মন্দিরে প্রবেশ করলেই ডান হাতে পুরনো বট গাছের নিচে ভক্তরা মানত শুরু করেন। শুরু হয় সেই গাছ পরিক্রমা। তারপর মানত করে গাছের ডালে পুজোর সুতো বেঁধে দিতে হয়। মন্দিরে বসে থাকা সাধু চিত্তমোহন রায় বলেন, যার যা মনের ইচ্ছা সুতো বেঁধে দিলে বাবা জটিলেশ্বর তা পূরণ করেন। এই সময় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট। ফলে পরীক্ষার্থীরা এখন বেশি করে সেখানে ভিড় করছে।

মন্দির কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর এই মন্দিরের উন্নয়ন কল্পে সম্প্রতি এক কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। এর মধ্যে ৬৮ লক্ষ টাকার কাজ ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। তা দিয়ে মন্দিরের সিমেন্টের রাস্তা মার্বেল দিয়ে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। মন্দির লাগোয়া গাছগুলো বাঁধাই করা হয়েছে। তৈরি হয়েছে অতিথিশালা। মা কামাখ্যার মন্দিরের সামনে বারান্দা পাকা হয়েছে। পুরো মন্দির চত্বরে সীমানা প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে। আগামী দিনে পর্যটকদের স্বার্থে আরও কিছু কাজের পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। সেখানে একটি সুলভ শৌচালয় নির্মাণের দাবি তোলা হয়েছে। রবিবার আর সোমবারের বিশেষ দিনে সেখানে গড়ে প্রতিদিন ২ হাজার লোকের সমাবেশ হয়। আর অন্যদিনে গড়ে হাজার পুণ্যার্থির ভিড় হয়।

বাপি ঘোষ

গজলডোবার চরে হর্স রাইডিং
স্বপ্ন দেখছে কৃষ্ণরা

মহাভারতের যুদ্ধে অর্জুনের ঘোড়ায় টানা রথের সারথি ছিলেন কথিত সেই শ্রীকৃষ্ণ। আর সে ঘোড়ার নাম কী ছিল তা জানা নেই। তবে উত্তরবঙ্গের গজলডোবাকে বিরাট টুরিস্ট হাব তৈরি করার জন্য সরকারি যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝে নেমে নিজের সংসারকে জয়ী করে তুলতে জয় নামক ঘোড়াকেই হাতিয়ার করেছে স্থানীয় কৃষ্ণ। প্রাথমিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের পর্যটন প্রকল্প ভোরের আলো নিয়ে কয়েকদিন আগেও আদালতের জটিলতা ছিল। এখন তা মিটে গিয়েছে। ফলে উত্তরবঙ্গের পর্যটনে নতুন দিগন্ত গজলডোবা ঘিরে মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে উৎসাহ বাড়তে শুরু করেছে। গজলডোবা ঘিরে যখন রাজ্যের পর্যটন দফতর এক নতুন পর্যটন জয়ের দিকে এগচ্ছে তখন স্থানীয়রাও গজলডোবা নিয়ে অনেক ভাবনা শুরু করেছেন। ওই এলাকারই বাসিন্দা গরিব মানুষ কৃষ্ণ চৌধুরী কোচবিহারের ঘোকসাডাঙা থেকে ঘোড়া জয়-কে কিনে এনে সংসারে হাসি ফোটাতে মাঠে নেমেছে।

রাস্তাঘাট দারুণ। তিন বছরে তিন হাজার কোটি টাকা খরচ করে বিশ্ব পর্যটনে উত্তরবঙ্গকে নতুন দিশায় নিয়ে যেতে গজলডোবা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক স্বপ্নের প্রকল্প। ভোরের আলো। কাছেই পাহাড় ডাকে, সুন্দরী তিস্তার পাশে সবুজের জঙ্গল। বহু পাখি, বন্য প্রাণী নিয়ে সে এক অন্যরকম পর্যটন পরিবেশ হতে চলেছে গজলডোবা। ইতিমধ্যে একশ কোটি টাকা খরচ করে কিছু কাজ হয়েছে। আর সে সবের মধ্যে জয়কে এনে তার পিঠে পর্যটকদের চাপিয়ে নিজের তিন ছেলেকে মানুষ করার কাজে নেমেছে কৃষ্ণ। তার এক ছেলে আবার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন। দুই ছেলে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। প্রতিদিন বিকেল তিনটায় তার ঘোড়া জয়কে গজলডোবা ব্যারাজের কাছে এনে পর্যটকদের ডাকতে থাকে কৃষ্ণ। বড়রা জয়ের পিঠে চাপলে ৪০ টাকা, আর ছোটরা চাপলে ২০ টাকা। বিকেল তিনটে থেকে সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত চলে জয়কে নিয়ে কৃষ্ণর এক অন্যরকম সংসার জয়ের সংগ্রাম। চার বছর আগে মুখ্যমন্ত্রী যখনই গজলডোবা নিয়ে বিরাট পর্যটন প্রকল্পের ঘোষণা করেন তখন থেকেই ঘোড়া ছুটিয়ে চলছে তার সেই যুদ্ধ। জয়ের পিঠে পর্যটকদের চাপিয়ে সংসার যুদ্ধে জয়ী হওয়ার দৌড়ঝাঁপ। কৃষ্ণ বলেই ফেলে, জয়কে দিয়েই আমরা করব জয়। আগে এক সময় ফেরিওয়ালার কাজ করে যুদ্ধ চলত তার। ভোরের আলো ঘোষণা হতেই জয়ের ঘোড়ায় নিজের সংসার চাপিয়ে প্রতিদিন তিন থেকে চারশ টাকা রোজগার আসছে তার। ভোরের আলো ফুটিয়ে তুলতে চায় সেখানকার মিলনপল্লীর এই কৃষ্ণ।

বা. ঘো.

ধারাবাহিক কাহিনি

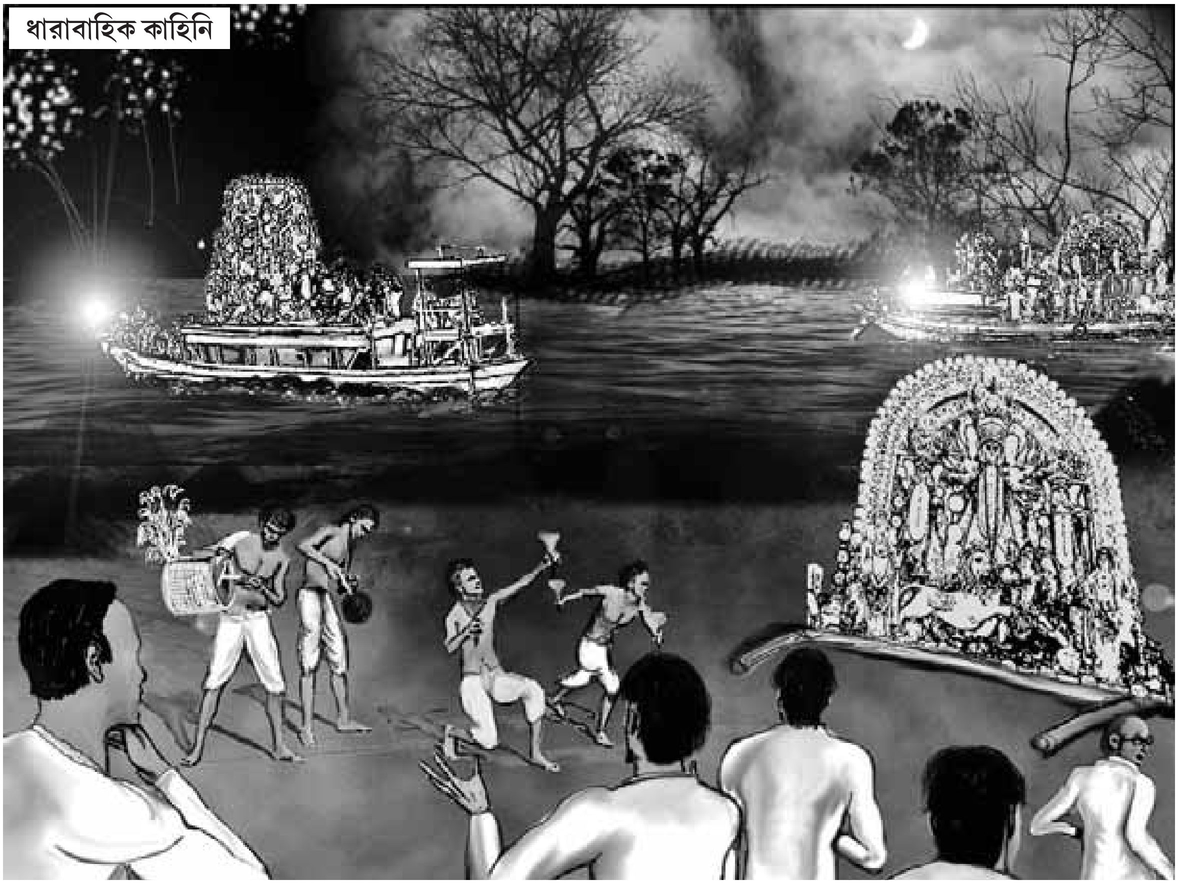

৪৯

তরাই উৎরাই

শহরে জ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুল চালু হওয়ার পর হাসপাতালের বেশ উন্নতি হয়েছে। একজন সিভিল সার্জেন ছাড়াও পাশ করা লেডি ডাক্তার এসেছেন। তবে খুদিদা পরিবারের চিকিৎসার ব্যাপারে অবনী ডাক্তারকেই ভরসা করেন বেশি। ছোট করে ছাঁটা চুল আর বিরাট গোঁফের অধিকারী অবনী গুহ নিয়োগীকে আপাতদর্শনে রাগী মানুষ বলে মনে হলেও আসলে তিনি একটি শিশুর মতো সরল ব্যক্তি। স্বদেশি ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত। বুক বাজিয়ে কংগ্রেস করেন। গত কয়েক মাসে গান্ধিজির আন্দোলনে সাড়া দিয়ে শহরের বহু মানুষ হয় জেলে, নয় আত্মগোপন করে আছেন। আন্দোলনের মোকাবিলা করতে গিয়ে পুলিশ প্রশাসন রীতিমতো কড়া পদক্ষেপ নিলেও অবনী ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করতে সাহস পায়নি। আসলে টাউনের সাহেবদেরও অসুখবিসুখের ভয় যথেষ্ট। হয়ত এই কারণেই তারা ডাক্তারদের গ্রেপ্তার করতে সাহসী হয়নি। মোটা খদ্দরের ধুতি আর চাদর পরে, একখানা নড়বড়ে সাইকেল নিয়ে তিনি বহাল তবিয়তে ডাক্তারি এবং স্বদেশিয়ানা চালিয়ে যাচ্ছেন তাই।

আশ্বিনের হিম লেগে এই সময়টায় অনেকেই জ্বরজারিতে ভোগে। শোভার শরীরটা খারাপ যাচ্ছিল ক'দিন হল। পুজোর ক'টা দিন যাতে ভোগান্তি না হয়, সেটা ভেবে খুদিদা খবর পাঠিয়েছিলেন অবনী ডাক্তারকে। তিনি এলেন সন্ধে নাগাদ। গগনেন্দ্র তখন শ্বশুরবাড়িতেই ছিল। শোভার জ্বর নিয়ে যে সে খুব একটা চিন্তিত ছিল, সেটা ভাবলে ভুল হবে। সে মনে মনে ছটফট করছিল সংবাদের আশায়। আজ ষষ্ঠীর সন্ধে। বীরেন কিংবা রজনীবাবুর কাছ থেকে যে কোনও মুহূর্তে সংবাদ আসতে পারে জেনে সে উত্তেজনায় ছটফট করছিল। দূর থেকে অবনী ডাক্তারকে আসতে দেখে সে প্রথমে ভেবেছিল, বীরেনের লোক আসছে সাইকেল চেপে। অবনী ডাক্তার দোরগোড়ায় সাইকেল থেকে নামতে, সে ভুল বুঝতে পেরে লজ্জা পেল একটু।

'তুমি খুদিদার জামাই না?' সাইকেলের হ্যান্ডেল থেকে ক্যাম্বিসের ব্যাগটা হাতে নিয়ে গম্ভীর গলায় শুধালেন তিনি, 'কবে এলে?'

'এই তো!' গগনেন্দ্র একটু লজ্জা পেল।

'পুজোয় থাকছ তো?' এবার একটু হাসি দেখা গেল ডাক্তারের পেল্লায় গোঁফের আড়াল থেকে, 'টাউনের বিসর্জন দেখেছ আগে? দেখবার জিনিস। দশমীর দিন চারদিক থেকে লোক আসে করলায় দুর্গা বিসর্জন দেখার জন্য। শোভা কোথায়?'

'ঘরেই আছে। আপনি ভিতরে যান।'

ততক্ষণে খুদিদা বেরিয়ে এসেছেন। তিনি এগিয়ে এসে অবনী ডাক্তারের হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে বললেন, 'আসুন আসুন!'

শ্বশুর আর ডাক্তার ভিতরে চলে যাওয়ায় গগনেন্দ্র একটু স্বস্তি বোধ করল। এ পাড়াতে কোনও পুজো নেই। কয়েকটা বাড়ি পরে গোবিন্দ লশকরের বাড়ির সামনে অবশ্য ভিন্ন কারণে ভিড় জমেছে। কোনও অবস্থাতেই জীবন-মৃত্যুর স্রোত থেমে থাকে না। গোবিন্দ লশকরের বুড়ো বাপ ঘণ্টাখানেক আগে পরলোক গমন করেছেন। দুপুরবেলাতেও ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে পান চিবিয়ে ঘুমাতে গিয়েছিলেন গোবিন্দবাবুর বাবা। তারপরেই বুকে ব্যথা। গগনেন্দ্র সেদিকেই এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে। ষষ্ঠীর বিকেলে পরলোকে যাওয়াটা কতটা পুণ্য বা অপুণ্য, সে নিয়ে একদল মাঝবয়সি লোক একটা কদম গাছের নিচে মন দিয়ে আলোচনা করছিলেন। গগনেন্দ্র কিছু না ভেবেই তাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। থেমে গেল মধুদার দলবলকে দেখে।

'তুমি আবার এখানে কেন?' মধু দাশগুপ্ত ভুরু কুঁচকে প্রশ্নটা গগনেন্দ্রর দিকে ছুড়ে দিলেন। 'পুজো-গন্ডার দিন! ঘরে পোয়াতি বউ রয়েছে। গোবিন্দর বাপ অনেকদিন বেঁচেছে। তুমি গিয়ে ফুর্তি করো। লোকের অভাব হবে না।'

তারপর একজন বয়স্ক লোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হরিহরকাকা নাকি আজ দুপুরেও ভোজ খেয়েছে শুনলাম?'

'ভোজ বলে ভোজ!' লোকটি একটু হাসল, 'ইলিশ মাছ আর পাঁঠা। বয়স হলে কী হবে! হরিহরের নোলা ছেলেছোকরাকেও হার মানাত! তা ভাগ্যবান লোক মানতে হবে মধু! মরার দিনটা খুব ভাল বেছে নিয়েছে হরিহর!'

গগনেন্দ্র আবার পথ ধরল। বড় রাস্তার দিকেই হাঁটা ধরল সে। মোড়ের মাথায় ডেলাইট লাগিয়ে চেয়ার-টেবিল পেতে স্বদেশি ফান্ডের জন্য চাঁদা তুলছিল কয়েকজন যুবক। সেখানে বেশ ভিড়। দুটো কনস্টেবলকেও দেখা গেল দাঁড়িয়ে থাকতে। গগনেন্দ্র সেদিকে যাবে কি না ভাবতে ভাবতে দেখতে পেল, বীরেন্দ্রর চকচকে ঘোড়ার গাড়িটা তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

'এই যে গগন!' গাড়ি থেকে প্রায় লাফ দিয়ে নেমে এসে বীরেন্দ্র ডাকল তাকে। 'লোকটা এসেছিল!' উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে, 'কেতো তাকে ফলো করে খবর জেনে এসেছে। সে কোথায় উঠেছে জানো?'

'কোথায়?'

'পান্ডাপাড়া গ্রামে সুবোধ শর্মার বাড়ি। হিদারুর সঙ্গে সে বাড়ি একবার গিয়েছিলে না তুমি?'

গগনেন্দ্র চমকাল। একদিন গল্পে গল্পে সে বলেছিল বীরেনকে সে বাড়িতে যাওয়ার কথা। কিন্তু এই মুহূর্তে সুবোধ শর্মার নাম শোনার জন্য সে বিন্দুমাত্র তৈরি ছিল না।

'চলো। গাড়িতে ওঠো!' গগনেন্দ্রর হাত ধরে টান দিল বীরেন, 'অনেক আলোচনা করতে হবে। সুবোধ শর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাটা জরুরি।'

'এখনই যাবে?' গাড়িতে বসতে বসতে জানতে চাইল গগনেন্দ্র, 'উপেনের লোক কি টাকা নিয়ে গিয়েছে?'

'সে টাকা নিতে লক্ষ্মী পুজোর দিন আসবে।' কোচোয়ানকে গাড়ি ছোটানোর হুকুম দিয়ে বলল বীরেন, 'সুতরাং আমাদের হাতে সময় আছে। এক্ষুনি সুবোধবাবুর সঙ্গে দেখা করাটা ঠিক হবে না। এতে সেই লোক ঘাবড়ে গিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। আমি ঠিক করেছে, সে বাড়িতে যাব বিজয়ার পরদিন। কিন্তু তার আগে ডিসকাশন দরকার। প্ল্যান বানাতে হবে। উপেন আর মহেন্দ্রকে জলপাইগুড়ি ফিরিয়ে আনার এটাই সুযোগ।'

কোচোয়ান উদ্দেশ্যহীনভাবে গাড়ি ছোটাতে লাগল শহরের পথ দিয়ে। অজস্র গাছপালা, দিঘি-পুকুরে ভরা গণ্ডগ্রামের মতো শহরের মূল পথগুলি তখন লোকজন আর গোরুর গাড়িতে ভরতি। বাইরে থেকে মেলা লোক এসেছে রাত দশটার উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ধরবে বলে। ট্রেন ধরার আগে তারা পুজোর বাজার করে নিচ্ছে। জ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুলের চমৎকার দুটো খেলার মাঠের সামনে দিয়ে, ঝরঝরা নদীর পুল পেরিয়ে, করলা নদীর ঝুলন্ত ব্রিজ টপকে, যোগেন মজুমদারের বাড়ি ছাড়িয়ে, উমাপদ ব্যানার্জির বাড়ির পাশ দিয়ে গাড়ি এল থানার সামনে। সেখান থেকে বাঁক নিয়ে কোচোয়ান ধরল রেস কোর্সের রাস্তা। দুই আরোহীর অবশ্য খেয়াল ছিল না, কোন পথে তারা ছুটছে। তারা তখন পুজোর আবহাওয়া ভুলে গিয়ে মগ্ন হয়ে রয়েছে গভীর পরিকল্পনায়।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে গোটা শহরটা দু'বার পাক দিয়ে থানার কাছে ক্লাইভ স্ট্রিটের উৎসবমুখর রাস্তায় তৃতীয়বার ফিরে এল। আর্য ব্যাঙ্কের লাল ইটের বাড়িটার সামনে এসে বীরেন্দ্র হাঁটুতে একটা চাপড় মেরে বলল, 'অল রাইট! প্ল্যান একটা বার করতেই হবে। এখন চলো সেলিব্রেট করা যাক! আমার চর কেতো ঠিকমতো ফলো করে খবর এনেছে— এই জন্য সেলিব্রেশন করা উচিত। শ্যাম্পেন খাবে?'

গগনেন্দ্র একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'শ্যাম্পেন? কোথায় খাবে?'

'আমার বাড়িতেই খাব। পুজোর চার দিন বাড়িতে এসব একটু-আধটু খাওয়া হয়।' একগাল হেসে জানায় বীরেন। তারপর রাস্তায় জনস্রোতের মধ্যে একজনকে দেখে চিৎকার দিয়ে ডাকে, 'এই যে নিত্যবাবু! এদিকে! গাড়িতে! এই কোচম্যান। রোকো রোকো!'

লাগামের টানে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে যায়। লোকজনের ধাক্কা এড়িয়ে নিত্যবাবু একমুখ হাসি নিয়ে গাড়ির সামনে এসে বলেন, 'এই ভিড়ে আপনার ঘোড়া রেগে যায়নি দেখছি! কোথায় যাচ্ছেন?'

'খবর কী?' বীরেন গাড়ি থেকে নেমে এল। গগনেন্দ্রও নামল। টাউনের পথঘাট যে খুব একটা ভাল— এমন নয়। টানা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে কোমর ধরে গিয়েছিল তার।

'এবার পুজোয় দেশে যাননি দেখছি!' গগনেন্দ্র হাসল, 'প্রোগ্রাম আছে নাকি পুজোয়?'

'এই তো ফাইনাল রিহার্সাল দিতে যাচ্ছি। সারারাত মহড়া চলবে। নবমী পর্যন্ত টানা শো। তবে রিস্ক নিলাম না, বুঝলেন? পৌরাণিক প্লে-ই করছি। অষ্টমীর দিন চলে আসুন শো দেখতে। বিবেক সাহার বাড়িতে হচ্ছে সে দিন। আপনার শ্বশুরবাড়ির পাশের পাড়া।'

বেশ উৎসাহের সঙ্গে আমন্ত্রণ জানালেন নিত্যবাবু। তারপর একটু ঝুঁকে পড়ে কিঞ্চিৎ গলা নামিয়ে বললেন, 'একটু কনফিডেনশিয়াল নিউজ দিচ্ছি। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এবার রবিবাবুকে টাউনে আনবই। ওঁর সেক্রেটারির চিঠি এসেছে গত পরশু।'

'বাঃ!' তারিফের সুরে শব্দটা উচ্চারণ করল বীরেন। তারপর হঠাৎ গগনেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, 'শোভার নাকি শরীর ভাল যাচ্ছে না? কী হয়েছে ওর?'

'বিশেষ কিছু নয়।' গগনেন্দ্র উদাসভাবে জানায়, 'ওই একটু জ্বর-টর হয়েছে আর কী! অবনী ডাক্তার দেখতে এসেছিল সন্ধের সময়।'

'রবিবাবু এলে শোভা কিন্তু খুব খুশি হবে, তা-ই না?'

পুজোর দিনগুলি এর পর কেটে গেল। দশমীর দিন বিকেল থেকে রাশি রাশি লোক এসে জড়ো হতে লাগল করলা নদীর তীরে। ঝুলনা পুল থেকে দিনবাজার পুল পর্যন্ত সেজে উঠল রাশি রাশি ডেলাইটে। দু'-তিনটে নৌকো জোড়া দিয়ে, তার উপর তক্তা পেতে মঞ্চ বানিয়ে ঘুরতে লাগল একেকটি দুর্গাপ্রতিমা। সেসব ভাসমান মঞ্চ মুখরিত হয়ে উঠল ঢাকের বাদ্যে, আরতির ধোঁয়ায়, নাচের ছন্দে। জলপাইগুড়ি টাউনের প্রতিমা বিসর্জন এক বিখ্যাত ব্যাপার। সকাল থেকেই ট্রেন আর নৌকা বোঝাই করে মানুষ আসতে শুরু করেছিল সেই মচ্ছবের ভাগীদার হতে। করলা নদীতে তো সারা বছরই ডুব-জল। এ ভারী আজব নদী বটে!

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

সাজসজ্জার দেশজ কারুশিল্প প্রদর্শনী জমজমাট

‘শ্রীমতী ডুয়ার্স’ ক্লাব আয়োজিত সাজসজ্জার দেশজ কারুশিল্প প্রদর্শনীতে তিনটে দিন রীতিমতো জমজমাট ছিল জলপাইগুড়ির ‘আড্ডাঘর’। কলকাতার শিল্পী সুদত্তা বসু রায়চৌধুরী ও তাঁর সৃজনী ‘কোষ’-এর পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ির সুরুচিসম্পন্ন শ্রীমতীদের জন্য হাজির করা হয়েছিল টেরাকোটা ..... আফগানি কাঠ ইত্যাদি একগুচ্ছ পেনড্যান্ট, ইয়াররিং, যার পুরোটাই হাতে বানানো এবং উৎকর্ষর নিরিখে একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দেয়। ২ জুন শুক্রবার বেলা পাঁচটায় প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন ‘শ্রীমতী ডুয়ার্স’ ক্লাবের সদস্যরা। এর পরই আড্ডাঘর ভরে ওঠে শ্রীমতীদের সমাগমে। শিল্পীর সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় মেতে ওঠেন উৎসাহীরা। শনি-রবি বাকি দু’দিন একই চিত্র। ডুয়ার্সে এ ধরনের প্রদর্শনী এই প্রথম, তাই শুরুর আগে একটা উদ্বেগ ছিলই—স্বীকার করলেন শিল্পী সুদত্তা। কিন্তু তিন দিনে ডুয়ার্সের গুণগ্রাহীদের মধ্যে যে সাড়া মিলেছে, তাতে এককথায় উচ্ছ্বসিত শিল্পী। ‘আড্ডাঘর’ পরিচালন সমিতির

ইচ্ছেয় ও শিল্পীর সম্মতিতে এবার আড্ডাঘরে থাকছে দেশজ কারুশিল্পের স্থায়ী প্রদর্শনী, যেখানে নারী ও পুরুষের পরিধেয় নানা সামগ্রী এবং গৃহসজ্জার টুকটাক হস্তশিল্প নিয়মিত রাখা হবে বিক্রয়ের জন্য। সেই সঙ্গে শিল্পীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলে নিজেদের পছন্দমতো জিনিস বানাবারও সুযোগ থাকছে। ‘শ্রীমতী ডুয়ার্স’ ক্লাব অনুমোদিত এই প্রদর্শনীতে সাড়া মিলেছে শিলিগুড়ি, মাল, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার থেকেও। সবার প্রশ্নই ছিল মোটামুটি একই ধরনের—আমাদের শহরে এই প্রদর্শনী কবে হচ্ছে? শিল্পীর কাছেই জানা গেল, আগস্ট মাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহান্তে জলপাইগুড়ির সঙ্গে কোচবিহারেও বসছে এই প্রদর্শনী।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মৌরলার টক-ঝাল মিষ্টি

ডুয়ার্সের ডিশ

উপকরণ: মৌরলা মাছ ২৫০ গ্রাম (মাথা ফেলে ভাল করে কেটে পরিষ্কার করে ধুয়ে রাখতে হবে ও নুন-হলুদ মেখে রাখতে হবে), হলুদ ১ চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা ৪ চা চামচ, কাঁচালংকা বাটা ২ চা চামচ, টম্যাটো বাটা ২ চা চামচ, কাঁচা আম বাটা (একটু সেদ্ধ করে জল ফেলে বাটতে হবে), সরষের তেল ৫০ গ্রাম, নুন-চিনি স্বাদ অনুসারে, ধনেপাতা ও কাঁচালংকা কয়েকটি, কালো সরষে সামান্য।

শ্রাবণী চক্রবর্তী

প্রণালী: কড়াইতে তেল দিয়ে তেল গরম হলে ২টি কাঁচালংকা ও সরষে ফোড়ন দিন। তারপর একে একে পেঁয়াজ বাটা, কাঁচালংকা বাটা, টম্যাটো ও কাঁচা আম বাটা দিয়ে খুব ভাল করে কষাতে থাকুন। হলুদ দিয়ে আবার কষাতে থাকুন। এবার নুন ও সামান্য চিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন। মশলা থেকে যখন তেল বেরবে, তখন নুন-হলুদ দিয়ে মেখে রাখা মাছগুলো কষে মশলাতে দিয়ে দিন। খুব সামান্য জল, দু’টি কাঁচালংকা দিয়ে কড়াই ঢেকে দিন ও গ্যাসের আঁচ একদম কমিয়ে রাখুন। ৫ মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে খুব ভাল করে সাবধানে নাড়ুন এবং ধনেপাতা দিয়ে আবার ঢেকে রাখুন ও গ্যাস বন্ধ করে দিন। কিছুক্ষণ কড়াই ওভাবে ঢেকে রাখুন, তারপর গরম ভাতে খান। টক-ঝাল-মিষ্টি সব মিশে অপূর্ব স্বাদ উপভোগ করবেন, যা এই গরমের দুপুরে আপনার লাঞ্চকে ভীষণ আকর্ষণীয় করে তুলবে।

চা বাগানের আদিবাসী মেয়েদের ফুটবলে টেনে এনে অন্য লড়াইয়ে বঙ্গ রত্ন ভবানি

একদম ডানদিকে ভবানি মুন্ডা

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তার দেবী চৌধুরানী উপন্যাসে ভবানি পাঠকের কথা মেলে ধরেছিলেন। উত্তরবঙ্গের বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে সেই ভবানি পাঠককে কেউ বলতেন ডাকাত, কেউ বলে থাকেন ইংরেজ হটাতে এক লড়াকু যোদ্ধা। সেই ভবানি পাঠক আজ না থাকলেও সেই বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল এলাকাতেই এক অন্য ভবানির জন্ম হয়েছে। এ ভবানির কোনও ডাকাতির বদনাম নেই, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোনও গল্প নেই তার। তবে বন্ধ চা-বাগানের অভুক্ত মেয়েদের খেলার মাঠে এনে ফুটবলার তৈরির এক নতুন ইতিহাস তৈরির শিরোপা জুটেছে তার কপালে।

পুরো নাম ভবানি মুন্ডা। বয়স ২৩ বছর। বিবাহিত। স্বামী দশরথ কুজুর। কালো ছিপছিপে গড়ন। ডুয়ার্সের চা-বাগান আর জঙ্গলেই তার বেড়ে ওঠা। সাত বছর বয়স থেকে মাঠের মধ্যে ফুটবল নিয়ে দৌড়। একেই আদিবাসী পরিবার, তারপর আবার সংরক্ষণশীল। বাধা আছে, কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না। লড়তে লড়তেই আজ নিজে যেমন ফুটবলার তেমনই তার মতো আরও আদিবাসী মেয়েদের ঘর থেকে বের করে এনে ফুটবলার তৈরি করছেন। এভাবে ৫৫ জনের টিম তৈরি করে বিভিন্ন স্থানে ফুটবলে জয়জয়কার এনে দিয়েছেন। যেখানে বন্ধ চা-বাগানের সুযোগ নিয়ে মেয়ে পাচার হয় সেখানে সীমা লোহার, প্রিস্কা এক্কা, সুজাতা ওঁরাও, রীতিকাদের মতো অভাবী মেয়েদের টেনে এনে মাঠে ফেলে দেওয়া। নিজেও একটি চা আর ঘুগনির দোকান করেন মাধ্যমিক পাশ ভবানি। সেই চা আর ঘুগনি দিয়েই নিজের আর অন্য মেয়েদের নিয়ে মাঠের লড়াই। ২০১৫ সালে তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ফুটবল নেত্রীকে রাজ্যের বঙ্গ রত্ন উপাধি দিতে ভোলেননি। শিলিগুড়ি থেকে খবরটি পেয়ে মঙ্গলবার সমাজসেবী মদন ভট্টাচার্য ১২টি ফুটবল, ৫৫টি বুট জুতো ও জার্সি কিনে তাদের হাতে তুলে দিতে ভোলেননি। আলিপুরদুয়ারের জেলা পরিষদের সভাধিপতি মোহন শর্মার হাত দিয়েই মদনবাবু ফুটবল প্রতিভা ভবানির হাতে সেসব তুলে দেওয়া হবে। তবে ভবানির লড়াই থামেনি। বলেন, একটা চাকরি পেলে লড়াই আরও জোরদার হয়। তাদের খেলার মেয়েরা যাতে নিয়মিত স্কুলে মিড ডে মিল পান তার জন্য সোমবারই মিরিকে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে চিঠি পাঠিয়েছেন ভবানি। বলেন, আরও সকলের সহযোগিতা পেলে জঙ্গলের এই মেয়েরা বাংলার মান তুলে ধরতে আরও খেলার মাঠে নামতে চায়। ইতিমধ্যে সেখানকার মেয়েরা কয়েকটি ক্ষেত্রে বাংলার খেলাতে প্রতিনিধিত্ব করে বাংলার সম্মান উঁচুতে মেলে ধরেছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

বেড়াতে চলুন ছোট্ট ছুটিতে

২ রাত ৩ দিনের প্যাকেজ টুর

(শিলিগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি)

ওল্ড সিল্ক রুট	: ৪৫০০ টাকা
পেলিং	: ৫৫০০ টাকা
লোলেগাঁও রিশপ	: ৪৫০০ টাকা
গ্যাংটক সঙ্গে ছাঙ্গু	: ৫৫০০ টাকা
ডুয়ার্স	: ৪১০০ টাকা
দার্জিলিং	: ৪৯০০ টাকা

(খরচ জনপ্রতি)

প্যাকেজ খরচের অন্তর্গত
খাওয়া, থাকা, সাইট সিইং

দ্রষ্টব্য: প্রতি প্যাকেজে অন্তত ৮ জন হতে হবে

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

HOLiDAYAAR

Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928

Cooch-Behar Office:
Ph: +91 9434042969

Jalpaiguri Office: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Road Jalpaiguri 735101
Ph: 03561-222117, 9434442866

তর্ক চলুক

সরকারি হাসপাতালে না গিয়ে ডাক্তারবাবুর প্রাইভেট চেম্বারে গেলে উন্নত চিকিৎসা মেলে কি?

শ্রীমতী ডুয়ার্স

বেশ কিছু মতামত এসেছে দপ্তরে। তার থেকে দুটো বাছাই করে দেওয়া হল। আগামী সংখ্যায় আরও মতামত।

ডাক্তারবাবুর প্রাইভেট চেম্বারে পরিষেবা বেশি, চিকিৎসা একই!

এ কথা অস্বীকার করার কোনও পথ নেই। সরকারি হাসপাতালের বহির্বিভাগে স্টেথো হাতে ডাক্তারবাবু সক্রিয় থাকেন ঠিকই, কিন্তু যেন বড্ড উড়ু উড়ু মন। কখন গিয়ে নিজের দোকানের ঝাঁপ তুলে বসবেন, সেই আশাতেই উদাস হয়ে রুগি দেখেন। আর এই উদাসীনতা দেখেই অস্থির হয়ে ওঠেন রুগি বা তার সঙ্গী স্বজন। তাই তাঁরা হাসপাতালের চাইতে ডাক্তারবাবুকে তাঁর প্রাইভেট চেম্বারেই দেখানোর কথা শ্রেয় মনে করেন। যে করেই হোক, ডাক্তারের ফি জোগাড় করে নিয়েই আসেন তাঁরা। তাই সরকার যত মাইনেই দিক, রুগির ফি হাতে না পেলে চিকিৎসক-সন্তুষ্টি পূর্ণ হয় না। চিকিৎসা বিনামূল্যে বা দাতব্য হতে পারে না। চিকিৎসকের দক্ষিণার সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র রুগিরও নিজের স্বাস্থ্যের জন্য খরচ করার আত্মতৃপ্তি আসে, যা চিকিৎসার পক্ষে সহায়ক বইকি। কাজেই ডাক্তারবাবু হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রকৃত সক্রিয় থাকলে তাঁর প্রাইভেট চেম্বার নিয়েও কোনও আপত্তি থাকে না।

সৌম্য ভট্টাচার্য, আলিপুরদুয়ার

হাসপাতালের বহির্বিভাগে ডাক্তারবাবু ভ্যাবাচ্যাকা!

শয়ে শয়ে রুগি, সঙ্গে আত্মীয়স্বজন ও দালালের চিৎকার-চেঁচামেচি, পূতিগন্ধময় পরিবেশ, এর উপর আবার এমার্জেন্সি কেস থাকলে সোনায় সোহাগা— এসবের মধ্যে সত্যি ডাক্তার বেচারি রীতিমতো ভ্যাবাচ্যাকা। এই অবস্থায় রুগিকে মন দিয়ে দেখবার মতো পরিস্থিতি কতটা থাকে তা ভাববার বিষয় বইকি। এমন বহু ডাক্তার আছেন, যাঁরা হাসপাতালের রুগিদের কৌশলে নিজেদের প্রাইভেট চেম্বারে নিয়ে আসার ফিকির জানেন। কাজেই হাসপাতাল ও প্রাইভেট চেম্বার— দুইয়েতেই রুগি দেখতে পারেন সমান যত্ন নিয়ে। সবটাই নির্ভর করে ডাক্তারবাবুর শরীরী ভাষা এবং রুগিবাহিনীর উৎকণ্ঠার পরিমাণের উপর। তবে ভ্যাবাচ্যাকা না কাটলে কিন্তু কোনওটাই সম্ভব নয়।

দেবলীনা মোহন্ত, গুয়াহাটি

যে কেউ পাঠাতে পারেন। মেইলে srimati.dooars@gmail.com ডাক যোগে **শ্রীমতী ডুয়ার্স। আড্ডাঘর। মুক্তাভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১।** বা হাতে।

অরণ্য মিত্র

দীননাথ চৌহানের রিসর্টে আশ্রয় নিয়েছে শুক্লা দাস। খবর পেয়ে কনক দত্ত হাজির হলেন সেই এলাকায়। কিন্তু শুক্লা দাসকে কিডন্যাপ করার প্ল্যান কি সহজে সফল হবে? নিজের প্রথম স্বাধীন রাত উপভোগ করতে গিয়ে মনামি এর মধ্যেই নিজের ভিতর টেনে নিয়েছে ফোটোগ্রাফার মায়াঙ্ককে। তার সামনে এখন অতি উত্তেজনাময় দিনের হাতছানি। অন্য দিকে দিল্লি এক্স-এর বোসবাবু ফিরে এসে গুটি সাজাচ্ছেন। নবীন রাই তাঁকে সহযোগিতার জন্য বাড়িয়ে দিয়েছেন হাত। তিনি কি দীননাথের রিসর্টে হামলা চালানোর কথা ভাবছেন? আপাত সমাপ্তির পথে কি তবে অপেক্ষা করছে রক্তক্ষয়ী কিছু মুহূর্ত? অপরাধ এবং যৌনতার বৃত্ত সম্পূর্ণ করে দিয়ে তবে কে জিতবেন? বুদ্ধ ব্যানার্জি? নাকি কনক দত্ত?

১০০

দু'পাত্র হুইস্কি পেটে যাওয়ার পর মনমেজাজ বেশ প্রফুল্ল হয়ে গিয়েছে নবীন রাইয়ের। উলটো দিকে বসা বোসবাবু অবশ্য এসব ছুঁয়ে দেখেন না আজকাল। তিনি ব্যাকপ্যাকে রাখা অস্ত্রগুলি থেকে একটা পিস্তল বার করে নাড়াচাড়া করছিলেন। অটোমেটিক রাইফেলটা একে ফর্টি-সেভেন, কিন্তু দেশি মাল। কাজ চলে যায়, তবে বেশি ফায়ার হলে লক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তা ছাড়া বুলেটে সুইং করে। শিলিগুড়ি থেকে এর বেশি তিনি কিছু আশা করেননি। তবে গ্লক পিস্তল দুটো আসলি মাল।

'তবে দাসবাবু বিট্রে করেছে বলছেন?' নবীন রাই কিঞ্চিৎ লঘু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'বাকিরাও তো বিট্রেয়ার দাদা!'

'দাসকে আমি আমার জায়গায় অ্যাপয়েন্ট করেছিলাম নবীন।' বোসবাবু ঠান্ডা গলায় বললেন, 'তুমি কি জানো যে ওরা রঞ্জিতকে সরিয়ে দিয়েছে? ক্যাভেন্ডিসের মতো এফিশিয়েন্ট লোক আমাদের বেশি নেই। কিন্তু ওকে দায়িত্ব দিলে ও বুদ্ধ ব্যানার্জির পুরো দলটাকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। এতে বিপদের সম্ভাবনা থাকবে। আমি সেটা চাইছি না। আমি যাব শুধু দাসকে সরিয়ে দিতে। বাকিদের নিয়ে ভাবার জন্য দিল্লির কর্তারা আছেন। তাঁরা ব্যানার্জিকে সমীহ করেন।'

'কিন্তু দাসকে পাচ্ছেন কোথায়?'

নবীন রাইয়ের প্রশ্নে বোস মৃদু হাসলেন। তারপর পিস্তলটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললেন, 'তোমরা খুব বোকা। তোমাদের উচিত ছিল কন্যাসাথির উপর নজর রাখা। আমি জানি, ওরা আগামীকাল কোথায় জড়ো হচ্ছে।'

'আপনি কি সেখানে ওদের উপর হামলা করতে চাইছেন?' নবীন রাই সোজা হয়ে বসে বললেন, 'জায়গাটা কোথায়?'

'সেটা তোমার জানার দরকার নেই।' বোসবাবু হাসলেন। এখানে তোমার একটাই দায়িত্ব। আমাকে আর্মস দেওয়া। ভুলে যেয়ো না যে, ওরা শিলিগুড়িতে তোমার উপর ফোর ফাইভ বোরের রাইফেল নিয়ে হামলা করেছিল। হেভি রাইফেল উইদ সাইলেন্সার। ব্যানার্জির সঙ্গে নর্থ-ইস্টের প্রত্যেকটা আর্মস ডিলারের জানাশোনা আছে। কাল অপারেশনে দুটো গ্লক আর একটা দেশি মেড একে সাতচল্লিশ নিয়ে নামতে চাইছি না। সেখানে দাস আর সুরেশ কুমার একসঙ্গে থাকবে। আশা করা যায়, সিকিয়োরিটিও থাকবে। আমি চাইব দাসকে নামিয়ে দিয়ে কেটে পড়তে। কিন্তু আমার সঙ্গে লোক থাকবে মোটে দু'জন।'

'দু'জন?' নবীন রাই অবাক হন। 'দু'জনকে নিয়ে অপারেশনে যাওয়াটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? তার চেয়ে অনেক ভাল হত দাসকে নজরে রেখে সুযোগ বুঝে মেরে দেওয়া। এটা ক্যাভেন্ডিস সহজেই করে দিত।'

'হুইস্কির এই একটা অসুবিধে নবীন! চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়। ডুয়ার্সে আমাদের সোর্স বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। দুবাইতে বসে আমার পক্ষে নিজের সোর্স লাগিয়ে ব্যানার্জির

টিমকে ট্র্যাক করা দিনের পর দিন সম্ভব না। আমি ফিরে গেলে আমার সব ক'টা সোর্স এবার ডুয়ার্স ছেড়ে চলে যাবে। তাই কাজটা আমাকেই করতে হবে এবং কালকেই।'

কথাগুলো বলে বোসবাবু ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। নবীন রাই ভাবছিলেন, আরও এক পাত্র গলায় ঢালবেন। কিন্তু সে ইচ্ছে দমন করে শুকনো গলায় বললেন, 'তবুও দাদা, রিস্ক থেকেই যাচ্ছে।'

'তোমার স্টকে আর্মস কী আছে?'

'একটা এম সিক্সটিন ফোর এ রাইফেল। কার্তুজ যথেষ্ট পাওয়া যাবে।'

'গুড!' বোসবাবুর মুখে আলো ফুটে উঠল। কারণ ওই রাইফেল থেকে মিনিটে আটশো বুলেট ফায়ার করা যায়। নবীন রাইয়ের দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'এ জিনিস কি নেপালের মাওবাদীদের কাছ থেকে পেয়েছ? এদিকে ওদের কাছেই চার-পাঁচটা ছিল এই রাইফেল! অরিজিনাল না চাইনিজ?'

'চাইনিজ। তবে কাজের ক্ষেত্রে কোনও তফাত নেই।' নবীন রাই আবার পানপাত্র ভরতে ভরতে জানালেন, 'পারলে দাসের সঙ্গে সুরেশ কুমারকেও উড়িয়ে দিয়েন কালকে।'

'সেটা তার ভাগ্যের উপর নির্ভর করছে নবীন।' বোসবাবু চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে হাত দুটো মাথার পিছনে নিয়ে একটু চাপ দিলেন। কটমট শব্দে তাঁর ঘাড়ের পেশিগুলো আলগা হল। 'তবে একটা একটা করে সরিয়ে দিলে খেলাটা জমবে ভাল। সুরেশ কুমার যদি বেঁচে যায়, তবে ক্যাভেন্ডিস আর তুমি মিলে তার হিসেবটা করে দিয়ো। রাইফেলটা কখন পাচ্ছি?'

'কাল কখন যাচ্ছেন অপারেশনে?'

'শিলিগুড়ি ছাড়ব দুপুরের পর।'

'সকালের মধ্যে পৌঁছে যাবে আপনার হাতে। অপারেশনের রেজাল্টটা জানাবেন নিশ্চয়ই?'

'অব কোর্স! রাতে জেগে থেকো কাল। ফোন করে দেব।'

বলে উঠে পড়লেন বোসবাবু। নবীন রাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে ব্যাকপ্যাকটা হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সকাল দশটার একটু আগে কনক দত্তর কাছে পাকা খবর পৌঁছাল। গয়েরকাটা আর বানারহাটের মাঝামাঝি জায়গায় একটি রিসর্টে ঢুকেছে শুক্লা দাসের গাড়ি। সে রাস্তায় পরপর কয়েকটা রিসর্ট আছে। সেগুলো পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে ওই লাইনের শেষ রিসর্টটি। শুক্লা দাস সেখানেই ঢুকেছে।

দরজার সামনে অপেক্ষমাণ দুই সহযোগী তাঁকে অনুসরণ করল।

১০১

সকাল দশটার একটু আগে কনক দত্তর কাছে পাকা খবর পৌঁছাল। গয়েরকাটা আর বানারহাটের মাঝামাঝি জায়গায় একটি রিসর্টে ঢুকেছে শুক্লা দাসের গাড়ি। সে রাস্তায় পরপর কয়েকটা রিসর্ট আছে। সেগুলো পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে ওই লাইনের শেষ রিসর্টটি। শুক্লা দাস সেখানেই ঢুকেছে। তাকে ফলো করে দেবমালা যাদবের লোক সেই রিসর্টে গিয়েছিল বুকিং-এর জন্য, কিন্তু জানা গিয়েছে, পুরো রিসর্ট আগামীকাল পর্যন্ত কেউ বুক করে রেখেছে।

খবরটা পাওয়ার পর কনক দত্ত আর দেরি করেননি। পরি ঘোষাল ততক্ষণে জলপাইগুড়ি থেকে ধূপগুড়ি চলে এসেছিলেন। তাঁকে নিয়ে কনক দত্ত গাড়ি ছুটিয়েছিলেন অকুস্থলের দিকে। রাম পান্ডে করিৎকর্মা লোক। শুক্লা দাস যে রিসর্টে আশ্রয় নিয়েছে, তার একটা অফিশিয়াল নাম থাকলেও এলাকায় সেটা দীননাথের রিসর্ট নামে পরিচিত। দীননাথ চৌহান নামের এক ব্যক্তি সে রিসর্টের ম্যানেজার। আশ্চর্য ইংরেজি জ্ঞানের কারণে দীননাথ সে এলাকায় বেশ বিখ্যাত। কিন্তু সে রিসর্ট পুরো বুকড থাকার কারণে রাম পান্ডে শাল্মলী লজ নামক আরেকটি রিসর্টে দুটো রুম বুক করে ফেলেছে। এই রিসর্টটা জঙ্গলে ঢোকার রাস্তার ঠিক মুখটায়। সেখান থেকে দীননাথের রিসর্ট মোটামুটি এক কিলোমিটার।

পরি ঘোষালকে নিয়ে কনক দত্ত যখন শাল্মলী লজে গাড়ি ঢোকালেন, তখন দুপুর প্রায় দেড়টা। রাম পান্ডে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল। পরি ঘোষাল তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

'দীননাথের রিসর্টে আর কেউ আছে নাকি?' কনক দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি ভিতরে ঢুকেছিলে?'

'মনে হল, দু'-তিনজনের বেশি লোক নেই।' রাম পান্ডে জবাব দিল, 'ম্যানেজার দীননাথ চৌহানকে বললাম যে, রিসর্ট তো ফাঁকাই আছে। একটা রুম তো দেওয়া যেতেই পারে। কিন্তু উনি বললেন, দুপুরের মধ্যেই সবাই চলে আসবে। কী একটা কালচারাল গ্রুপের নাকি মিটিং আছে সেখানে।'

'কালচারাল গ্রুপই বটে!' কনক দত্ত হাসলেন, 'মনে হচ্ছে, বুদ্ধ ব্যানার্জির লোকজন আজ সেখানে কোনও একটা উদ্দেশ্যে আসবে। সে ক্ষেত্রে আমাদের ওয়েট করা ছাড়া উপায় নেই।'

'শুক্লা দাস কিন্তু আপনাকে দেখলে সাবধান হয়ে যাবে। আপনাকে সে চেনে।'

'ঠিক।' পরি ঘোষালের কথাটা মেনে নিয়ে কনক দত্ত রিসর্টের দিকে পা বাড়ালেন, 'দেবমালা এসে পৌঁছালে তাঁকে একবার পাঠানো যেতে পারে বুকিং-এর অজুহাতে।'

পাশাপাশি দুটো ঘর বুক করেছিল রাম পান্ডে। তার একটায় দেবমালা থাকবে। রাম পান্ডে লাগোয়া আরেকটা কম দামি রিসর্টে থাকবে বলে গাড়িটা সেখানেই রেখেছে। দেবমালার আসতে আরও ঘণ্টাখানেক। কনক দত্ত এবং পরি ঘোষাল একটা ঘরে থাকবেন ঠিকই, কিন্তু দেবমালার সঙ্গে তাঁদের প্রকাশ্যে কথাবার্তা হবে না। বস্তুত, তাঁরা চারজন যে এখানে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে জমায়েত হচ্ছেন, সেটা গোপন রাখার জন্যই অপরিচিত হওয়ার ভান করাটা জরুরি।

'আপনারা কি রাতে শুটিং দেখতে যাবেন?' খাতায় নাম লিখতে লিখতে কনক দত্তর দিকে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন রিসর্টের রিসেপশনিস্ট। 'সামনেই নদীর পাড়ে একটা ছবির শুটিং চলছে দু'দিন ধরে। টুরিস্টদের অনেকেই দেখতে যাচ্ছে রাতের বেলায়। দিনরাত শুটিং হচ্ছে। আপনাদের তো গাড়ি আছে।'

'কী ছবি?' কনক দত্ত বেশ উৎসাহ দেখিয়ে জানতে চাইলেন।

'বউদি চারশো বিশ। দেবজিৎ আর দোয়েলের রোমান্টিক গানের সিকোয়েন্সের শুটিং হচ্ছে। চাঁদের আলোয় পাহাড়ি নদীর বুকে ডান্স। কাল তো পূর্ণিমা।'

'নদীর পাড়ে মানে দীননাথের রিসর্টের দিকটায় নাকি?'

'আপনারা দীননাথের রিসর্টের নাম শুনেছেন তাহলে?' রিসেপশনিস্ট মুচকি হাসল, 'ওই রিসর্টের মেইন সমস্যা হল, ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। রাস্তাটা আবার এলিফ্যান্ট করিডর। সন্ধের পর রিস্কি। তবে শুটিং হচ্ছে রেল ব্রিজের কাছে। আসার সময় একটা রেল লাইন পার হয়েছেন না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।' দু'জনে সমস্বরে জানালেন।

'লাইনের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা গিয়েছে, সেটা ধরে খানিকটা গেলেই স্পটে পৌঁছে যাবেন।'

'নিশ্চয়ই বেশ ভিড় হচ্ছে শুটিং-এ?'

'ভিড় বলতে লোকাল পাবলিকই বেশি। এখন তো অফ সিজিন। টুরিস্ট বেশি নেই। তবে যাঁরা আছেন, একবার করে যাচ্ছেন। চাঁদের আলোয় নদীটা খুব ভাল দেখায় কিনা।'

'বাঃ!' কনক দত্ত যেন খুব খুশি হলেন কথাটা শুনে, 'যাব তাহলে।'

১০২

দিনটা বেশ উষ্ণ। তবে রিসর্টে নিজের ঘরের সামনে গাছের নিচে সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে মনামির খুব একটা অস্বস্তি হচ্ছিল না। একটু আগে মায়াঙ্ক একটা ক্যামেরা নিয়ে পিছনের বাগানে ঢুকেছে পাখির ছবি তোলার জন্য। যাওয়ার সময় মনামির গালে আলতো চুমু দিয়ে গিয়েছে সে। গত রাতে বেশ হাওয়া বইছিল। মনামি পাতলা রাত-পোশাকের উপর হালকা চাদর জড়িয়ে যখন মায়াঙ্কের দরজায় টোকা দিয়েছিল, তখন বিদ্যুৎ ছিল না। পরপর এক কামরার বাড়িগুলোর মাঝে ফুট দশেকের ব্যবধান। আকাশে ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে দ্বাদশী চাঁদের আলোয় রিসর্টের চারদিক বড় মায়াময় দেখাচ্ছিল তখন। দরজায় টোকা দিতেই মনামি শুনেছিল মায়াঙ্কের গলা, 'কাম ইন।'

ঘরের ভিতর ব্যাটারি ল্যাম্প জ্বলছিল। গেঞ্জি আর বারমুডা পরে বিছানায় আধশোয়া হয়ে মোবাইল ঘাঁটছিল মায়াঙ্ক। মনামিকে ঢুকতে দেখে বেশ অবাক হয়ে বলেছিল, 'আরে, তুমি? আমি তো ভেবেছিলাম রিসর্টের স্টাফ।'

'তারা তো আজকের মতো চলে গিয়েছে মায়াঙ্ক।' মনামি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলেছিল, 'আর আমি তো বলেইছিলাম, রাতে তোমাকে নক করব।'

'সেটা আমি সিরিয়াসলি নিইনি।' মায়াঙ্ক ফোনটা বিছানায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে বসেছিল, 'তুমি কি সত্যিই এখন "শকুন্তলা" প্রোজেক্টটা নিয়ে আলোচনা করতে এসেছ?'

'ঠিক তা নয়।' বিছানার এক কোণে বসে বলেছিল মনামি, 'ওয়েদারটা দেখেছ মায়াঙ্ক? দুষ্মন্তের সঙ্গে প্রথম মিলনের দৃশ্যটা এমন একটা রাতে শুট করা যায় না?'

'অসম্ভব নয়।' মায়াঙ্ক তখনও সিরিয়াস ছিল না। 'চলো, বাইরেটা একবার ভাল করে দেখি।' বলেছিল সে। তারপর নেমে আসতে চেয়েছিল বিছানা ছেড়ে। কিন্তু মনামি ততক্ষণে শরীর থেকে চাদরটা দু'হাত দিয়ে দু'দিকে সরিয়ে দিয়েছে। ফিনফিনে রাত-পোশাক শরীরের উপরের দিকে আরও বেশি সংক্ষিপ্ত। তবে মায়াঙ্ক নিজেও পর্ন ফিল্মের ফোটোগ্রাফার। নারী শরীর দেখে অভ্যস্ত। সে একটু হেসে বলেছিল, 'ঘরে গরম লাগছে নাকি?'

'ঘরে নয়। ভিতরে।' কাঁধে আলতো ঝাঁকুনি দিতেই মনামির পিঠ বেয়ে বিছানার উপর চাদরটা খসে পড়েছিল। 'একটা রিহার্সাল করা যায় না?'

'রিহার্সাল?' এবার একটু বিস্মিত হয়েছিল মায়াঙ্ক। 'কী রিহার্স করবে?'

'হাউ টু সিডিউস দুষ্মন্ত ইন মুনলাইট।' বলেই হাত বাড়িয়ে চেপে ধরেছিল মায়াঙ্কের কবজি। তারপর এক টানে তাকে নিজের শরীরের উপর টেনে এনে ফিসফিস করে বলেছিল, 'উইদাউট ক্যামেরা। লাইক দিস!'

মায়াঙ্ক পলকের জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল তখন। ততক্ষণে মনামি তার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়েছে। সেই গভীর আশ্লেষ মিশ্রিত চুম্বনের কাছে আত্মসমর্পণ না করে থাকতে পারাটা কোনও পুরুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। মায়াঙ্কও পারেনি। তারপর আলো নিবিয়ে দিয়েছিল মনামি। খোলা জানলা দিয়ে আসা চাঁদের আলোতে ভিজে যাওয়া বিছানায় দু'টি শরীর গলে যেতে খুব বেশি সময় নেয়নি। মায়াঙ্ক কতটা সুখী হয়েছিল তা বলা মুশকিল, কিন্তু মনামি নিজের ঘরে ফিরে এসেছিল পালকের মতো হালকা শরীর আর মন নিয়ে।

কিন্তু সেসব গত রাতের কথা।

সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে থাকতে থাকতে গাড়ি আসার শব্দ পেল মনামি। আজ দুপুরের মধ্যে অনেকে আসবে এখানে। তার মধ্যে একমাত্র সুরেশ কুমারকেই সে চেনে। বাকিদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবে। আলোচনা হবে। তারপর পরশু সকালে তারা বেরিয়ে পড়বে নতুন অ্যাডভেঞ্চারে।

গাড়িটা তার তিরিশ ফুটের মধ্যে এসে দাঁড়াল। একজন মহিলা নামছেন গাড়ি থেকে। অতি সাধারণ চেহারার এক মহিলা। পরনে সাধারণ ছাপা শাড়ি। মনামি তাকাল মহিলাটির দিকে। মহিলাটিও দেখেছে তাকে। সে এগিয়ে আসছে। মনামি বুঝতে পারল যে, সাধারণ হলেও চেহারার মধ্যে বিচিত্র চুম্বক আছে মহিলার। ভরাট স্বাস্থ্যের মধ্যে চাপা অথচ অদম্য একটা আকর্ষণ আছে। গড়পড়তা পুরুষ এই আকর্ষণের টানে খুশি মনে ধরা পড়বে। ইনি নিশ্চয়ই শুক্লা দাস।

গাড়ির ড্রাইভারটাও নেমে এসেছে। সে-ও এগিয়ে আসছে মনামির দিকে। মহিলাটি এবার মনামির চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর একেবারে কাছাকাছি এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'মনামি তো তোমার নাম, তা-ই না?'

'আপনি কি শুক্লা দাস?'

'ঠিকই ধরসো ভাই।' সে হাসল,

মায়াঙ্ক পলকের জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল তখন। ততক্ষণে মনামি তার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়েছে। সেই গভীর আশ্লেষ মিশ্রিত চুম্বনের কাছে আত্মসমর্পণ না করে থাকতে পারাটা কোনও পুরুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। মায়াঙ্কও পারেনি।

'তোমার সম্পর্কে যা সুনসি, তুমি তার সাইতে ভাল। তা বাসায় আর ফিরবা না তো?'

মনামি কোনও উত্তর না দিয়ে শুক্লা দাসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'বুজসি। ফিরবা না আর। হাতটা দাও। মিলাই। এরে সেনো? এর নাম রাজা রায়।'

মনামি এবার হাসিমুখে শুক্লা দাসের সঙ্গে করমর্দন সেরে রাজা রায় নামের লোকটার দিকে তাকাল। এর বিষয়ে সে কিছু জানে না। শুক্লা দাস তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই বোমাটারে সিনে রাখো রাজাবাবু! এর বডিতে যা বারুদ আসে তা তোমার গোটা টিমের কাসে নাই।'

তারপর মনামির গাল টিপে দিয়ে কৌতুকের সুরে বললেন, 'রাগ করলা নাকি? আমাদের কথা এইরকমই। এই রাজা রায় হইল জঙ্গি। এর আগে কোনও দিন জঙ্গি দেকসো?'

মনামি একটু অবাক হয়ে তাকাল রাজা রায়ের দিকে। সত্যিই কোনও মানুষকে দেখে বোঝা যায় না যে সে জঙ্গি। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই পড়ি-মরি করে ছুটে আসতে দেখা গেল দীননাথ চৌহানকে। আরেক দফা গেস্ট আসার কারণে সে খুব উত্তেজিত। ওদের কাছে এসে সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এভরিথিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ওকে ম্যাডাম। ওয়ান আউটসাইডার ডিমান্ড বুকিং বাট আমি না করে দিলাম।'

বাইরে থেকে একটা গাড়ি ফিরে গেল। কেউ এসেছিল বুকিং-এর জন্য।

'আমরা তো গোটাটাই বুকিং করেছি।' রাজা রায় ভুরু কুঁচকে বলল, 'কেউ এলে ভাগিয়ে দেবে।'

'আই ডু সার। আই গেট আউট ওয়ান টুরিস্ট জাস্ট!'

এবার মনামি আর সামলাতে না পেরে ফিক করে হেসে ফেলল।

(ক্রমশ)

চেন্নাইয়ে চেন রিঅ্যাকশন ২

কুয়াশা কি কাটল ফেলুদার অভিযানে? বিমানের টয়লেটে লুকিয়ে সিগারেট ফুঁকতে গিয়ে কে বেরিয়ে এসেছিল প্রবল আতঙ্কে? সে কথা চেন্নাইগামী বিমানে ওঠার আগেই বা কেন মনে পড়ছে লেখকের? গপ্পে গপ্পে আবার চলে আসছে ডিজিটাল ইন্টারমিডিয়েট-এর প্রসঙ্গ। ফেলুদার ছবিতে কার চেজিং আর অ্যাকশন দেখে লেখক কিঞ্চিৎ ভারাক্রান্ত, কিন্তু তিনি ভোলেননি, গোটা বিমানযাত্রায় মগজাস্ত্রকে শান দেওয়ার চিরকালের পদ্ধতি কীভাবে ব্যবহার করলেন সন্দীপ রায়। জমিয়ে পড়ার মতো আরও একটা কিস্তি।

বিমানবন্দরের অন্দরে আছি। কিন্তু বিমান অবধি যাওয়ার প্রধান ছাড়পত্র তখনও বকেয়া। পাব কি পাব না, ভেবে ভেবে... পাগল হওয়ার আগেই, মনে পড়ে গেল একটি শোনা ঘটনা। আমার জন্মের আগের সময়কার।

তখন বাগডোগরা আর দমদমের মাঝে ৩২ সিটের ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমানে এয়ার সার্ভিস চালু ছিল। জলপাইগুড়ির এক বন্ধুর কাকা একদিন তাতে করে প্রথমবার বিমান যাত্রা করছেন। সে যুগে তার আগে ট্রেনে-বাসে কোথাও তিনি 'নো স্মোকিং' বোর্ডের সম্মুখীন হননি। কার্যত, ইঞ্জিনের ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও সমান তালে ধোঁয়া উড়িয়ে জার্নি করেছেন বরাবর। কিন্তু সেবারে প্লেনের সিটে বসে দেখলেন, বেশ কয়েক জায়গায় জ্বলজ্বল করছে ধূমপান বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা। এমনকি উড়ান শুরুর আগে বিমানকর্মীরাও মাইক ফুঁকে সেই একই সাবধানবাণী ঘোষণা করল।

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের বাণী! প্লেন আকাশে উঠতে যেটুকু দেরি। তার মধ্যেই কাকাবাবুর উশখুশানি শুরু হয়ে গিয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর বৃষ্টির পূর্বাভাস ঘোষণা করলেই প্রকৃতি যেমন তার উলটো পথে চলতে বাধ্য, ঠিক তেমনই আমরা মানুষরাও অনেক সময় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা নিষেধাজ্ঞা দেখলে খাবি খেতে থাকি তার বিরুদ্ধাচরণ করার নিমিত্তে!

সিট বেল্টমুক্ত হওয়ার খানিকক্ষণের মধ্যেই কাকাবাবু লক্ষ করলেন, বিমানের পিছন দিকে দিব্যি একটি টয়লেট রয়েছে। সুতরাং এবার তাঁকে রোখে কে! 'নো স্মোকিং' বোর্ডগুলোর উদ্দেশে তিনি মনে মনে ভেঙিয়ে বললেন, 'নো জোকিং'! এবং সিট ছেড়ে টাল খেতে খেতে উঠে রওনা দিলেন গোপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির উদ্দেশে।

কিন্তু তার পরবর্তী পর্যায়ে ঘটনার এমনই অত্যাশ্চর্য এক সমাপতন ঘটল, যাকে

বলে পোয়েটিক জাস্টিস! ভাল করে টয়লেটের দরজায় খিল এঁটে ভদ্রলোক সবে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করেছেন, আর অমনি প্লেন পড়ল একটি গভীর এয়ার পকেটের গাড্ডায়। অর্থাৎ বিমানখানি বিনা ভূমিকায় ধাঁইধাঁই করে ভারী প্রস্তরখণ্ডের মতো আকাশ থেকে খসে পড়া আরম্ভ করল।

কাকাবাবু মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ জানতেন কি জানতেন না, সেটা কে জানে! তবে সেই মুহূর্তে বিমানটির পতনের কারণ যে একমাত্র তিনিই, অপরাধী মনের কল্যাণে তা জানতে তাঁর বাকি ছিল না। এবং বিমানসুদ্ধ বাকি যাত্রীদের সেটাই জানাতে, দড়াম করে টয়লেটের দরজা খুলে এক লাফে ছিটকে বেরিয়ে আসেন তিনি। সবার উদ্দেশে সকাতরে চেঁচিয়ে বলেন, হে ভগবান! এমন হবে জানলে আমি খবরদার সিগারেট ধরাতাম না! আমার দোষ নেবেন না প্লিজ... আপনাদের সবার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী!

দমদম এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে গল্পটা আমার অকারণে মনে পড়েনি। আমার বোর্ডিং পাসের বিষয়টি ফয়সালা হতে বিলম্ব তখন ক্রমেই প্রলম্বিত হচ্ছিল! এয়ারলাইন্স কাউন্টারের মেয়েটি তার কম্পিউটার স্ক্রিনে গভীর মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা দেখেই চলেছে। আমি তার হাতে আমার ট্রেন মান্থলির ফোটো আইডি-টা তুলে দিয়েছি প্রায় এক-দেড় মিনিট হল। কিন্তু তখনও সেটার দিকে তাকিয়ে দেখার ফুরসত হয়নি তার। ফলে, সে যত দেরি করছে, আমার বুকের মধ্যে ততই বাজে ঢেকুরের মতো বেলুন হয়ে ফুলছে টেনশন। আড়চোখে দেখছি, কাউন্টার থেকে একটু দূরে আমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাবুদা, সাগ্নিক ও শশাঙ্ক।

একদম শেষ মুহূর্তের এই মাউন্টিং টেনশনে প্রবল ইচ্ছে হল ওদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে অগ্রিম স্বীকারোক্তি করি, দোষ নেবেন না, আপনাদের সবার যাত্রাভঙ্গের জন্য, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমিই দায়ী!

মরিয়া হয়ে সেটা বলে ফেললে, যদি অন্তত খানিক টেনশনমুক্ত হওয়া যায়!

শেষ পর্যন্ত অবশ্য তেমন কিছু করতে হল না। কারণ সেই ইচ্ছে জেগে ওঠার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই, কাউন্টারের মেয়েটি জাস্ট দশ সেকেন্ডের একটি পাসিং দৃষ্টি ঝলকে আমার আইডি-টা খতিয়ে দেখে নিয়েছে। এবং তারপর সে এমন ভাবলেশহীন মুখে সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডিং পাস ইস্যু করল, যে আমার মনে হল, এই নিয়ে কিনা এতক্ষণ হাবিজাবি ভাবছিলাম? এ তো দেখছি, যা হোক একটা কাগজে একখানা ফোটো সেঁটে দিলেই কাজ চলে যেত! (ভবিষ্যতে হাতেকলমে তেমন চেষ্টা করার ঝুঁকি বশ্য কখনওই নিইনি। অন্য কাউকে নেওয়ারও পরামর্শ দিচ্ছি না।)

যা-ই হোক, বাগডোগরার গল্পে, এয়ার পকেটের খপ্পর থেকে ছাড়া পেয়ে প্লেনটি আবার যখন স্বাভাবিকভাবে উড়তে শুরু করেছিল, তখন কাকাবাবুর মনের অবস্থাটি কেমন হয়েছিল, আমি এবারে তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছিলাম। বাকিদের সঙ্গে হেঁটে এসে দাঁড়ালাম টার্মিনালের ভিতর সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলা লম্বা সিকিয়োরিটি চেকিং লাইনে। তখনও ভাবছি, ভাগ্যিস প্যানিক বাটনটি অতি জলদি টিপে ফেলিনি। নয়তো কাকাবাবুর মতো আমাকেও বোকা বনতে হত। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে হচ্ছিল, মর্নিং শোজ দ্য ডে। এই বেলা যখন উতরে গেলাম, মিশন চেন্নাই তো তাহলে অবশ্যই সফল হতে বাধ্য!

ঘণ্টা দুয়েক পরে। প্লেনটা সমুদ্রের উপর থেকে গোঁত্তা মেরে চেন্নাই উপকূলের দিকে মুখ ফেরাল। অনেক নিচে দৃশ্যমান সমুদ্র এবং সমুদ্রতট। একদম যেন প্রমাণ সাইজ গুগ্‌ল ম্যাপ। তবে তফাত একটাই। এখানে ভূগোলের সঙ্গে সঙ্গে যুগলে দেখা যাচ্ছে চলমান যানবাহন ও জলযানের নানামুখী স্রোত।

দমদমে উড়ান শুরু হতেই, মোটা একটা বইয়ের পাতায় মুখ ডুবিয়ে ফেলেছিলেন সন্দীপ রায়। বিমান অবতরণের ঘোষণা শুরু হতে, এবারে সেটায় পেজমার্ক রেখে বন্ধ করলেন। দেখে মনে হল, এর মধ্যেই প্রায় সত্তর শতাংশ পড়ে ফেলেছেন। মগজাস্ত্রকে সক্রিয় রাখার অতি প্রাচীন এবং বহু পরীক্ষিত এই ব্যায়ামটির কদর ইদানীং একটু পড়তির দিকেই। পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে, লাইব্রেরির তুলনায় অলিতে-গলিতে গজিয়ে ওঠা মাল্টিজিম (এয়ারকন্ডিশনড)-এর সংখ্যাই এখন অনেক বেশি। কিন্তু তবু রায় বাড়ির বৈঠকখানা কিন্তু আদলে প্রায় ছোটখাটো লাইব্রেরিরই মতো। এবং বই সেখানে শুধু আলমারিতে বন্দি নয়। ঘরের মেঝেতে অবধি পাঁজা পাঁজা এবং ম্যাগাজিনের থাক। বোধহয়, সেই সত্যজিৎ রায়ের আমল থেকেই।

পুরনো সেই সময়ের সঙ্গে নতুনের মেলবন্ধন আমরা সন্দীপ রায়ের পরিচালিত ফেলুদা সিরিজে দেখি। সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবিতে সন্তোষ দত্তর বিকল্প কোনও জটায়ুর কথা ভাবতে চাননি বলে তাঁর পরিচালনায় আমরা দুটোর বেশি ফেলুদার ছবি পেলাম না। সন্দীপ রায় কিন্তু সে জায়গায় হিন্দিতে মোহন আগাসে এবং বাংলায় রবি ঘোষ আর বিভু ভট্টাচার্যকে নিয়ে সাহস করে এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। হিন্দিতে ফেলুদার চরিত্রে শশী কাপুরকে নির্বাচনের ঐতিহাসিক ভুলটিও তিনি সামাল দিয়ে ফেলেছিলেন, পরবর্তীকালে সব্যসাচী চক্রবর্তীর হাতে ব্যাটন তুলে দিয়ে। সেই ফেলুদাকে একদিকে যেমন তিনি সেলফোন দিতে নারাজ, তেমনই আবার অ্যাকশন দৃশ্যের দরকারে তাঁকে ক্যারাটেতেও দক্ষ দেখাতে রাজি।

তবে হ্যাঁ, 'টিনটোরেটোর যীশু'র ক্ষেত্রে, ছবির দু'টি পর্যায়ে, পরিচালক হিসেবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যবধান অনেকটাই। কারণ আগেই বলেছি, প্রথম অংশ শুট হয়ে দুই-আড়াই বছর ছবিটি বাক্সবন্দি ছিল। যে ফাঁকে তিনি আরেকটি ফেলুদা তৈরি করেছেন, এবং বদলেছে তাঁর ছবি তৈরির আঙ্গিক। আমার স্পষ্ট মনে হল, হংকঙেই তিনি তাঁর কেরিয়ারে প্রথমবার অতিশয় গতিশীল হওয়ার মাশুল দিলেন। পাসপোর্ট করানো নেই বলে আমার শুটিং-এ যাওয়ার সুযোগ হয়নি। ফলে ল্যাবেই কাজটি প্রথম দেখলাম। আর চেন্নাইয়ের সেই ফগ মাখা রাশ আমাকে কিছুটা হতাশই করল। কারণ বেশির ভাগ দৃশ্যই মগজাস্ত্রের বদলে অ্যাকশন এবং কার চেজিং-নির্ভর। হয়ত নতুন সময়ের মাল্টিপ্লেক্সভিত্তিক দর্শকদের কথা ভেবেই এই ধাঁচটিকে সন্দীপ রায় প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে ফেলুদার আদি ঔজ্জ্বল্য নিঃসন্দেহে খানিকটা মেঘে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। সেই ছায়া এর পরবর্তী ফেলুদা ছবিগুলোয় ক্রমে ক্রমে আরও দীর্ঘ হয়েছে কি না, সেটা নিয়ে আমি মন্তব্য করব না। ফেলুদা-ফ্যান দর্শকরা উত্তরটা নিশ্চিত আগে থেকেই জানেন।

যা-ই হোক, আপাতত আমার চোখের সামনে শেষ রিল খতম হতেই স্ক্রিন সাদা হয়ে গেল। শুধু প্রোজেক্টর মেশিনের চাকা

হিন্দিতে ফেলুদার চরিত্রে শশী কাপুরকে নির্বাচনের ঐতিহাসিক ভুলটিও সন্দীপ রায় সামাল দিয়ে ফেলেছিলেন, পরবর্তীকালে সব্যসাচী চক্রবর্তীর হাতে ব্যাটন তুলে দিয়ে। সেই ফেলুদাকে একদিকে যেমন তিনি সেলফোন দিতে নারাজ, তেমনই আবার অ্যাকশন দৃশ্যের দরকারে তাঁকে ক্যারাটেতেও দক্ষ দেখাতে রাজি।

ঘোরার ফরফর শব্দ হয়ে চলেছে। আলো জ্বলে উঠল প্রসাদ ল্যাবরেটরির দোতলার প্রিভিউ রুমে, যেখানে আমাদের চারজনের সঙ্গে একসঙ্গে বসে রাশগুলো দেখছিলেন প্রসেসিং ডিপার্টমেন্টের কর্তা মিস্টার পুন্নাইয়া। একে একে আমাদের সবার মুখের উপর চোখ বোলালেন তিনি। তারপর বললেন, ওয়েল... দ্যাট'স ইট। অ্যাজ ইউ ক্যান সি, নিয়ারলি থার্টি পারসেন্ট অব দ্য রাশ ইজ এফেক্টেড।

এফেক্টেড তো বটেই, মনে মনে ভাবছিলাম। তবে ভাগ্য ভাল, পুরোটাই ব্যাডলি এফেক্টেড নয়। প্রতিটি ফিল্ম ক্যান যখন প্রোজেক্টরে চালানো শুরু হচ্ছে, লক্ষ করছিলাম, তাতে প্রথম দেড়-দু'মিনিট বিস্তর ফগের ঝলকানি। মানে, গোটা দৃশ্য জুড়ে যেন অনবরত হালকা বিদ্যুৎ চমকে চলেছে। কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে ব্যাপারটা থিতিয়ে যাওয়া আরম্ভ করল। রিলের একদম শেষ দিকে চলে এলে ছবি একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার। বুঝতে পারলাম, রিল যেহেতু গোল করে পেঁচানো থাকে, তাই উপরের অংশটি এক্সরে-তে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারপর পাক খেতে খেতে ফিল্মের পরের অংশ যত ক্যানের ভিতর দিকে চলে গিয়েছে, সেখানে এক্সরে-র কামড় হালকা হতে হতে একসময় সম্পূর্ণ ভ্যানিশ!

কিন্তু এবারে প্রশ্ন হল, ফগ ধরা ওই থার্টি পারসেন্ট মেরামতের উপায় কী হবে? মিস্টার পুন্নাইয়া আশ্বস্ত করে বললেন, উপায় হাতের কাছেই আছে। ভারতীয় ছবির উপর হংকং এয়ারপোর্টের এক্সরে স্ক্যানারের কোপ এই প্রথম তো নয়। ইতিপূর্বে একাধিক সাউথ ইন্ডিয়ান ছবি ওখানে শুটিং করতে গিয়ে একই সংকটে পড়েছে। কিন্তু তারপর ফগ তাড়িয়ে সেই সমস্ত নেগেটিভকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছে ইএফএক্স চেন্নাইয়ের ডিআই ডিপার্টমেন্ট। সুতরাং আগে ছবি এডিট করা হোক। তারপর মেপে মেপে ফগ ধরা অংশগুলো ডিআই করে নিলেই হবে। থার্টি পারসেন্টটা তখন হয়ত নেমে আসবে দশ বা পনেরো পারসেন্টে।

ডিআই বা ডিজিটাল ইন্টারমিডিয়েট তখন সিনেমা জগতে সদ্য আগত এক নতুন বিস্ময়। সেই পদ্ধতিতে ফিল্মের নেগেটিভ স্ক্যান করে আস্ত ছবিটাই কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কে ভরে ফেলা যায়। তারপর সফ্‌টওয়্যার দিয়ে যত খুশি কারিকুরি করে আবার সেটাকে ফেরত পাঠানো যায় ফিল্মে, যার সুবিধা একাধিক। এতদিন সিনেমায় স্পেশাল এফেক্ট সীমাবদ্ধ ছিল মান্ধাতার আমলের অপটিক্যাল পদ্ধতিতে, যেখানে মোল্লার দৌড় মসজিদ অবধি। গোটা ব্যাপারটা একে তো সময়সাপেক্ষ। তারপর আবার ফলাফল যদি মনোমতো না হয়, তখন সামান্য পরিবর্তন করতে চাইলেও গোটা পদ্ধতি আবার স্টেপ-ওয়ান থেকে শুরু করতে হবে। ঠিক যেন বিক্রম বেতালের কাহিনি!

এত ঝামেলাপূর্ণ বলেই ২০০০ সালের আগে অবধি নব্বই শতাংশ ভারতীয় ছবি স্পেশাল এফেক্টকে দূর থেকে নমস্কার করে বলত, খ্যামা দাও বাপু!

কিন্তু ডিআই আসার পর তারা সবাই চোখ কচলে টানটান সিধে হয়ে বসতে বাধ্য হল। সত্যিকারের বিস্ফোরণ না ঘটিয়েও পরদায় প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড দেখানো সম্ভব? দড়িতে ঝুলিয়ে নায়ককে দিয়ে উড়ন্ত লাথি মারার স্টান্ট শুট করে সেইসব দড়ি ছবি থেকে নিখুঁতভাবে মুছে দেওয়া সম্ভব? এবং এসব স্পেশাল এফেক্ট সহজসাধ্য হওয়ার পাশাপাশি বোনাস পাওনা হল, স্বচ্ছন্দে পুরো ফিল্মের কালার কারেকশন। অর্থাৎ, সিনেমা জুড়ে যত চাও ঝকঝকে ম্যাজিকের ফুলঝুরি সৃষ্টি করার এ এক অতি বড় নির্ভরযোগ্য জাদুদণ্ড! বাণিজ্যিক সিনেমা তো প্রথম দিকে এই খেলনাটি হাতে পেয়ে কী করবে আর কী না করবে, সেই ভেবে অস্থির। একদিকে দক্ষিণে রজনীকান্ত 'এন্থিরান' (রোবট) বানাচ্ছেন তো মুম্বইতে শাহরুখ খান 'রা-ওয়ান' বানানোর জন্য খুলে বসছেন রেড চিলিজ নামে পুরোদস্তুর একটা ভিএফএক্স কোম্পানি। তারপর এইসব বড় বড় রথী-মহারথীর প্রদর্শিত পথে, চুনোপুঁটি বাকি সকলে ঠেলাঠেলি করে লাইন লাগাতে আর দেরি করে? মাঝখান থেকে তালেগোলে, গল্পের দরকারে ডিআই নাকি ডিআই-এর দরকারে গল্প, সেটাও অনেকে গুলিয়ে ফেলতে লাগলেন। সাউথ থেকে শুরু হয়ে ক্রমে এই চেন রিঅ্যাকশন দাবানলের মতো ছড়িয়ে গেল সারা ভারতের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে। তবে গল্প যদি ঠিক না থাকে, তবে যে জগৎশ্রেষ্ঠ ডিআই-ও ছবিকে বাঁচাতে পারে না, সেটা যেমন রজনীকান্ত মালুম পেয়েছেন 'লিঙ্গা'তে, তেমনই শাহরুখও বুঝেছেন 'ফ্যান'-এ। প্রসাদ ল্যাবরেটরি থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা-পথ ইএফএক্স। সেটি প্রসাদ ল্যাবেরই আর-একটি ডিভিশন। এবং দক্ষিণের বহু বিখ্যাত সিনেমার ভিএফএক্স-এর আঁতুড়ঘরও। সেই কম্পাউন্ডের দিকে যেতে যেতে ভাবছিলাম, সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রকাণ্ড প্রতিভার জোরে, পুরনো অপটিক্যাল পদ্ধতিতেই ভূতের রাজার দৃশ্যে কী অসামান্য স্পেশাল এফেক্ট সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন। এবং সেই এফেক্ট এতটাই যথার্থ যে, আজকের ডিআই এবং কম্পিউটার গ্রাফিক্সে ব্যবহার করলেও দৃশ্যগুলো ওর চাইতে তাক লাগানো হত কি না সন্দেহ!

ফেলুদা সিরিজ নিয়ে সিনেমা দর্শক এবং বইয়ের পাঠক, উভয়ের কাছে তিনি নিজে তো চূড়ান্ত সফল বটেই। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর পুত্র সন্দীপ রায়ও হাফ ডজন ফেলুদার ছবি বানিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু তুলনায় দেখুন, গুপী-বাঘা মাত্র তিন নম্বরেই থেমে গেল। কারণ, ওই গল্প আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে যে ধরনের স্পেশাল এফেক্ট দরকার ছিল, সত্যজিৎ রায় জীবদ্দশায় তা পেলেন কোথায়? অথচ আজকে দেখুন, এস এস রাজামৌলি তাঁর 'বাহুবলী' ছবির উপাদান থেকে আরও আরও চরিত্র এবং কাহিনি খুঁজে বার করার জন্য নামী লেখকদের নিয়োগ করেছেন। একটি চূড়ান্ত সফল ফ্র্যাঞ্চাইজ বানিয়ে তিনি থেমে নেই। বরং সেটার ভিত্তিতে উপন্যাস, টিভি সিরিয়াল, কমিক্‌স— সমস্ত মাধ্যমে সৃষ্টিশীলতার তুফান তুলতে মেতে উঠেছেন। আজকের সময় তাঁকে সেই সুযোগগুলো দিচ্ছে বলেই তিনিও নিজের প্রতিভার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারছেন।

একেবারে অসম্ভব হলেও, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে একটা লাখ টাকার স্বপ্ন তাই আমার চোখেও ভাসে। সেই অসম্ভব স্বপ্নে আমি দেখতে পাই, গুপী-বাঘার জগৎ নিয়ে একটা রিমেক ছবির কথা ভাবছেন সত্যজিৎ রায়। আফ্রিকা, মিশর কিংবা আমাজন ছুটতে হচ্ছে না তার জন্য। বাংলায় বসে বাংলা ভাষাতেই তৈরি হচ্ছে সেই ছবি। এবং তারপরে ডাবিং হয়ে সেটা বাণিজ্য করছে ভারত তথা বিশ্ব জুড়ে। রাজামৌলি থেকে জেমস ক্যামেরন— সবাই বারে বারে সেই ছবি দেখছেন এবং নোটস নিচ্ছেন তাঁদের পরবর্তী ছবির অনুপ্রেরণা খুঁজতে। কেমন হত এমন হলে?

সত্যি, সত্যজিৎ রায়ের মতো জিনিয়াস এ যুগের টেকনোলজি হাতে পেলে কী যে করে দেখাতে পারতেন, তা ভাবতে যাওয়া... আর ব্রহ্মাণ্ডের সঠিক আয়তন মেপে বার করতে চাওয়া— দুটোই বোধহয় এক ব্যাপার!

অভিজিৎ সরকার

(ক্রমশ)

বাতিল পাম্প হাউসের গায়েও আর্জেন্টিনা রঙের তাজা পোচ, অলস অনিচ্ছায় বদলে যায় শহর

এই সে দিন ডুয়ার্সে গ্র্যান্ড ওপেনিং হল আরও একটি শপিং মলের। পেল্লায় বিল্ডিং। নজরকাড়া আলোর রোশনাই। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সেখানে বিভিন্ন ফ্লোরে হরেক আয়োজন। ব্র্যান্ডেড গয়নার দোকান। নামী পোশাক বিপণি। স্বচ্ছ কাচের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা ম্যানিকিন। প্রথম নজরে বিভ্রম জাগে। এক ঝলক দেখলে মনে হয় রক্তমাংসের মানুষ বুঝি! প্রৌঢ়ত্বের দরজায় কড়া নাড়া পুরুষ চোরাচোখে স্বল্পবসনা পুতুল-মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। এর নামই কি মিডল-এজ ক্রাইসিস? ঋতু অনুযায়ী, ফ্যাশন ও ট্রেন্ড অনুযায়ী এই মডেলদের পোশাক বদলে বদলে যায়। শপিং মলের দেওয়ালে তাকালে চোখে পড়ে হাসিমুখের মানুষের পোস্টার। কোম্পানির ছাপা আঁকা রঙিন ব্যাগ হাতে হাসিমুখের ক্রেতা। মনে হয়, এল ডোরাডোতে বসে আছি। পৃথিবীতে কোথাও কোনও দুঃখ নেই, হতাশা নেই। ইন্ডিয়া শাইনিং।

পাবলিকের স্মৃতিশক্তি বড্ড ক্ষীণ। এখন মনে করতে পারে না, এই যেখানে বিশাল গগনচুম্বী হাইরাইজ দাঁড়িয়ে আছে, আগে এখানে ঠিক কী ছিল? পোড়ো জমি? নাকি নোনা-ধরা ইটের কয়েকটা বসতবাড়ি! এখন আবছা আবছা লাগে। তবুও মনে পড়ে, একটা সিনেমা হল ছিল এখানে। বচ্চনের নতুন বই রিলিজ করলে কারা যেন গুরুর বিশাল পোস্টারে মালা লাগিয়ে দিত। 'হাউজফুল' বোর্ড লাগানো থাকত সামনে। বিশাল করে 'এ' লেখা 'রেশমা কি জওয়ানি'র মতো ছবির পোস্টারও পড়ত কখনও কখনও। ঘনিষ্ঠ দৃশ্য শুরু হলে কাঠের চেয়ার বাজিয়ে হল্লা করত কারা। হলের ভিতরটা উষ্ণ হয়ে উঠত। দর্শকদের মাথা এবং শরীর গরম হত আগুনের মতো। রেপ সিনের সময় অবশ্য কেউ কোনও শব্দ করত না। সব সহসা চুপ। ঘন হয়ে আসা পাবলিকের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুধু শোনা যেত প্রেক্ষাগৃহে। তার মধ্যেও অবশ্য মাথার উপরে লম্বা রডে ঝোলানো বড় ব্লেডের পুরনো ফ্যানগুলো একঘেয়ে আওয়াজ করত। রগরগে সিনের সময় হলে আগেই জেনে যেত হলের লাইটম্যান 'আশার'রা। তারা চুপটি করে বসে যেত ফাঁকা সিট দেখে। পরদার 'রেশমা'কে লেহন করত ভুখা-পেয়াসা চোখ দিয়ে।

সবসময় অবশ্য সাইলেন্ট মোড চলত না। গুরু গা গরম করা ডায়ালগ বললে খুচরো পয়সা ধেয়ে গিয়ে পড়ত রুপোলি পর্দায়। 'মুকদ্দর কা সিকন্দর' বা 'শোলে'র মতো মারকাটারি ছবি আসত ন'মাসে-ছ'মাসে। রিলিজের এক-দেড় বছর পর। তাতেও কী ভিড় কী ভিড়। তখন শুরু হত ব্ল্যাকারদের রমরমা। দশ টাকার টিকিট পঞ্চাশ। টিকিট কাউন্টার ছেড়ে দিয়ে ভদ্দরলোকরা সরে যেত ব্ল্যাকারদের দেখে। তবে কলেজে পড়া রুখা ছেলেছোকরা এলাকা ছাড়ত না। তারা লড়ে যেত সমানে সমানে। টিকিট কাটার সময় চলত দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল বাওয়াল। সেই ক্যাঁচালে ক্ষুর-টুরও চলেছে বিস্তর। পুলিশের জিপ এসে পড়লেই অবশ্য এরিয়ায় পুরো 'সন্নাটা'। হলের বাইরে তখন নেমে আসত শ্মশানের শান্তি।

শপিং মলের পাশেই একটা ফ্ল্যাট। আশিয়ানা অ্যাপার্টমেন্ট। এই জি প্লাস ফাইভ আবাসনটা নতুন। অরেঞ্জ আর অফ হোয়াইট কালারের ওয়েদারকোট কম্বিনেশন। বত্রিশশো টাকা প্রতি স্কোয়্যার ফুট। প্রতি ফ্ল্যাটের সামনে ব্যালকনি। জব্বর পসারওয়ালা একজন ডাক্তার ফ্ল্যাট কিনে রেখেছেন এখানে। তিনি অবশ্য থাকেন না। ফ্ল্যাটটা ফাঁকাই পড়ে আছে আপাতত। তার পাশেই পৌরসভার এক কাউন্সিলরের ফ্ল্যাট। তিনি ভাড়া দিয়েছেন আসাম থেকে ডুয়ার্সে আসা এক কাপড়ের ব্যবসায়ীকে। ফ্ল্যাটের বাইরে একরত্তি ব্যালকনি। ব্যালকনির রেলিং-এ শুকাচ্ছে রং-ওঠা ফতুয়া আর ছেঁড়া গামছা। এই ফ্ল্যাটটা জমির মালিকের। জমির বদলে ফ্ল্যাট আর নগদ টাকা পেয়েছেন। নাকের বদলে নরুন। নীচতলায় বিশাল গ্যারাজ। সিকিয়োরিটি গার্ড পাড়ার এক প্রৌঢ়। যৌবনে পকেটে মেশিন রাখত, পাড়া কাঁপাত। এখন বয়স হয়েছে বলে বানপ্রস্থ নিয়েছে।

শহরের এদিকটায় আশ্রয় নিয়েছেন মনীষীরা। সুকান্তনগর, সুভাষ পল্লি, নেতাজিনগর, সূর্যনগর, অরবিন্দ পল্লি। একসময় এটা ছিল উদ্বাস্তুদের কলোনি। তবে গগন-ছোঁয়া বিল্ডিংগুলো নিজেদের শরীর থেকে কলোনির 'নাম ও নিশান' তুলে দিচ্ছে। কলোনিয়াল হ্যাংওভারের দিন শেষ। পুরনো আঁশটে গন্ধ সরিয়ে নতুন নাম হয়েছে বৃন্দাবন গার্ডেন, গ্রিন সিটি,

সানি ভ্যালি।

আবাসন থেকে একটু এগিয়ে গেলে পুরনো বাজার। জামাকাপড়ের দোকান, ফলের দোকান, মুদিখানা, এগ রোল সেন্টার, জেরক্সের দোকান। প্রবলভাবে ক্ষয়ে যেতে যেতেও প্রাচীন দোকানিরা কেউ কেউ এখনও আছে। তারা আবাসনের বাবুদের স্যার বলে সম্বোধন করে, বিবিদের বলে ম্যাডাম। পুরনো চেনা লোকদের অবশ্য কিছু বলে না। আবাসনের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে বড় সড়ক। নদী যেমন করে সাগরে গিয়ে মেশে, ঠিক তেমনিভাবে এই পাকা রাস্তা গিয়ে মিশেছে ন্যাশনাল হাইওয়েতে। জেলার বৃহত্তর, উন্নততর আর পরিবর্তিত এই আবাসন এলাকাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া সেই রাস্তারও অন্য গল্প আছে। জেলা শহরের বাড়তি শরীরে সিলিকন ইমপ্ল্যান্টের মতোই যা আকর্ষক। চড়তি ‘উভরতি জওয়ানি’র মতোই যা উদ্ভিন্ন।

বাজারের মধ্যে আছে শনি মন্দির। শাস্ত্রে নাকি লেখা আছে, শনিদেবের দিকে সরাসরি দৃষ্টি দেওয়া বারণ। এখানে আগে একটা পত্রপত্রিকার দোকান ছিল। দফা ৩০২ থেকে খেলার আসর, সচিত্র কামশাস্ত্র থেকে অমর চিত্রকথা— সব পাওয়া যেত। দোকানদার অকালে মারা যাওয়ায় পাশের স্ট্যান্ডের রিকশাওয়ালারা চাঁদা দিয়ে শনি মন্দিরটা বানিয়েছে। শনিদেব কি সাবঅলটার্নদের দেবতা? হবে হয়ত। মন্দিরটায় আগে সিমেন্টের মেঝে ছিল। এখন চকচকে মার্বেল ফ্লোর। দেওয়ালে তকতকে টাইল। ফি-শনিবার ধুমধাম করে পুজো হয়। বাৎসরিক পুজো হয় বিশাল করে। খবরের কাগজ ছোট করে একটা ছবি ছেপে নিউজ অবধি করে।

বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে স্টেশন। ঢোকার মুখে অটো, রিকশা, টোটো, মিনিবাস, ম্যাক্সি ট্যাক্সির ভিড়। কিলবিল করছে মানুষ। পাশে টিন শেডের ঘর। ‘এখানে সাইকেল ও মোটরসাইকেল রাখা হয়।’ খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, বইয়ের স্টল আছে কিছু। স্টলের সামনে ঝোলানো সিনেমা পত্রিকায় এক লাস্যময়ী নায়িকার সাদা শার্টের বুকের দুটো বোতাম-খোলা সাহসী ছবি। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে হাসছে। উন্মুক্ত ক্লিভেজ। মুখে লাজুক ভঙ্গি। কফিরঙা ঠোঁট, ধবধবে গজদাঁত। নায়িকার পাশেই চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য দু’হাজার প্রশ্নের সেট। হাজার শারীরিক সমস্যার ঘরোয়া টোটকা। ওদিকে উঁকি দিচ্ছে জেলার এক কবির কাব্যগ্রন্থ। মোটা দাগের প্রচ্ছদ, জ্যালজেলে কাগজে ছাপা পেপারব্যাক বই। তিরিশ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট। ওপাশে পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট। একদিকে ‘লেডিস’। অন্য দিকে ‘জেনস’। টয়লেটের নোনা-ধরা হলদে দেওয়ালে পান, গুটকা, থুতু, কফের দাগের ববি প্রিন্ট। অ্যামোনিয়ার ঝাঁজালো গন্ধ।

কলকাতা থেকে জ্যোতিষী আসেন মাসে একবার করে। রংবেরঙের পাথর ধারণ করলেই বেকারের চাকরি, নিঃসন্তানের সন্তানপ্রাপ্তি, অভাগার ভাগ্যলাভ। গোপনে নেশা ছাড়ানোর জন্য ভিড় করে মানুষ। স্বপ্নদোষ, শ্বেতশ্রাব বা লিঙ্গশিথিলতা থেকে মুক্তি দিতেও কলকাতা থেকে আসেন অনেকে।

স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের বাইরে ডেলি বসে এক বুড়ো ভিখিরি। দুটো পা কাটা। একটা ময়লা চাদর দিয়ে কোলের কাছটা ঢাকা। চাদরে খুচরো পয়সা, দশ-বিশ টাকা। একশোর পাত্তিও আছে একটা। দুটো হাত সবসময়ই সামনে প্রসারিত করা। কথা বলে না। পা দুটো কী করে কাটল, কেউ জানে না। কেউ বলে, আগে হকারি করত, রেলে পা দুটো কাটা পড়েছে। কেউ বলে চিটফান্ডের দালালি করত, চিটফান্ড ডুবে যাওয়ায় পাওনাদারের চাপে রেলে গলা দিতে গিয়েছিল, কিন্তু শুধু পা দুটোর উপর দিয়ে ফাঁড়াটা গিয়েছে। কেউ বলে, ওসব কিছুই না, লোকটা পুলিশের খোঁচড়, মাছ বাজারে সুদে টাকা খাটায়। সত্যিটা যে কী, সেটা কেউ জানে না।

স্টেশন লাগোয়া হোটেল আছে কিছু। কলকাতা থেকে জ্যোতিষী আসেন মাসে একবার করে। রংবেরঙের পাথর ধারণ করলেই বেকারের চাকরি, নিঃসন্তানের সন্তানপ্রাপ্তি, অভাগার ভাগ্যলাভ। গোপনে নেশা ছাড়ানোর জন্য ভিড় করে মানুষ। স্বপ্নদোষ, শ্বেতশ্রাব বা লিঙ্গশিথিলতা থেকে মুক্তি দিতেও কলকাতা থেকে আসেন অনেকে। অর্শ, ফিসচুলা, পাইলস, ভগন্দরের ট্রিটমেন্ট করেন মাদ্রাজি ডাক্তার।

একটু কম দামি হোটেল-লজ ওইদিকটায়। সেখানে ঘুপচি ঘুপচি ঘরে অন্য কাজকর্ম হয়। লোকে বলে ‘চাদর পালটানো ব্যবসা’। উঠতি বড়লোক, কাঁচা টাকার ছোট ও মাঝারি ব্যবসাদাররাই আনাগোনা করে এসব জায়গায়। আশপাশের গঞ্জ, মহকুমা থেকে আসে কম টাকার আইটেমরা। মুখে রং মেখে দাঁড়িয়ে থাকে বাস স্ট্যান্ডে। শিকার ঠিক চিনে নেয় শিকারিকে। এবং শিকারি শিকারকে। দশ মিনিটে সব সমস্যার সমাধান। মাঝেমধ্যে অবশ্য জেলা পুলিশ রেইড করে। আইটেম, খদ্দের, হোটেলের ম্যানেজারকে লাইন দিয়ে পুলিশ ভ্যানে তোলা হয়। মিডিয়া সযত্নে ছবি তোলে। আইটেম ওড়না বা আঁচলে মুখ ঢেকে নেয়। খদ্দের ঢাকে হাতের রুমালে। পাবলিক ঠিক খবর পেয়ে জুটে যায়। ভিড় করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রগড় দেখে আর হ্যা হ্যা হাসে। খিল্লি করে।

স্টেশনের ওদিকে রেল কলোনি। পাশাপাশি অনেক রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, ছাতিম আর জারুল গাছ। ছাতিমের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে। গাছের আড়ালে একটা বড় দিঘি। নাম রেলপুকুর। সারিবদ্ধ একতলা, দোতলা কোয়ার্টার। মাথায় পিচ চট বিছানো। আগে কলোনির কোয়ার্টার, রেলিং, পাম্প হাউজ, জলের ট্যাংক— সব মেটে লাল রঙের ছিল। এখন নীল-সাদার নতুন পরত। মায় ‘অ্যাবানডন্ড’ লেখা পাম্প হাউজটার গায়েও নীল-সাদা আর্জেন্তিনার জার্সি। তার ওদিকে খেলার মাঠ। ছেলেপুলেরা আগে খেলত। ক্রিকেট সিজনে ক্রিকেট, ফুটবলের সময় ফুটবল। এখন কেউ মাঠে আসে না। মাঠের ধার দিয়ে মানকচুর সবুজ, পার্থেনিয়ামের জঙ্গল। এসবের আড়ালেই বাংলা আর চুল্লুর ঠেক। নেশার ট্যাবলেট, ডেনড্রাইট, ফেনসিডিল সুলভে পাওয়া যায়।

শহরের মূল বসত এলাকা ওই প্রান্তে। পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে-গলিতে ছোটবড় নানা সাইজের ক্লাব। তরুণ সংঘ। সেভেন বুলেট। আমরা ক’জন। বালক সংঘ। নেতাজি সংঘ। কয়েক দশক পেরিয়ে গেলেও সংঘ ভাঙেনি। বরং সরকারি অনুদানে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। দোতলা পাকা বাড়িতে একদা পার্টির জোনাল অফিস ছিল। বাইরে সাইকেল, মোটরসাইকেল গিজগিজ করত। এখন খাঁ খাঁ করে জায়গাটা। ভূতপ্রেতের আস্তানা হয়েছে বোধহয়। তবে স্থানীয় কাউন্সিল অন্য একটা অফিস খুলেছেন পাশের গলিতে। সেখানে টিভি আছে। সারাদিনই লোক ঘোরাঘুরি করে সামনে দিয়ে। সন্ধের পর জনসমাগম বাড়ে। চা আসে কাচের গেলাসে। চা খেতে খেতে কাউন্সিলরের সঙ্গে একসঙ্গে টিভিতে মেগাসিরিয়াল দেখে জনতা। মাঝেমধ্যে যে দিন অফিসে জেলার নেতার পায়ের ধুলো পড়ে, সে দিন পুরো চত্বর লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়।

শীত গিয়ে গ্রীষ্ম আসে। গ্রীষ্মকে সরিয়ে আগমন ঘটে বর্ষার। এভাবেই ঋতুরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ডুয়ার্সের দিন বদলায়। সেই সঙ্গে বদলায় ডুয়ার্সের কোলাজ। জনজীবন। ঋতুচক্রের মতোই চক্রবৎ ঘুরতে থাকে ডুয়ার্সের যাপনচিত্র।

ডুয়ার্সের পশুপাখি বিচিত্রা

বনমন্ত্রীর জেলায় তিন পার্কে হরিণ !

কিছু নেহি তো থোড়া থোড়া। জঙ্গল নেহি তো পার্কহি সহি! বনমন্ত্রীর নিজের জেলায় বন নেই, এ বদনাম তো আর সহ্য হয় না! আর তাছাড়া পর্যটন মানচিত্রে কোচবিহারকে তুলে আনার কথা বর্তমান সরকারের আমলে বারবার বলা হলেও, এখনও সে পরিস্থিতির কতটা উন্নতি হয়েছে তা অবশ্যই তর্কসাপেক্ষ। তবে পর্যটন দপ্তরের দৌলতে ইদানীং ডুয়ার্স যে পর্যটনের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে, সে কথাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ফি-বছর ডুয়ার্সে পর্যটকের ঢল নামলেও, কোচবিহারে তার এক-পঞ্চমাংশ আসে কি না সন্দেহ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তারা কোচবিহারের আশপাশ অর্থাৎ আলিপুরদুয়ারের জলদাপাড়া, চিলাপাতা ঘুরে এদিকটায় না এসে ফিরে চলে যায়। ফলে কোচবিহার যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে যাচ্ছে বলে পর্যটনশিল্পে যুক্ত ব্যক্তিদের মত। কোচবিহারে তেমন আকর্ষণ বলতে রাজবাড়ি। এ ছাড়াও এই জেলায় আরও বহু ঐতিহাসিক স্থান, স্থাপত্য থাকলেও সেসব এখনও কেন তেমনভাবে প্রচারের আলোয় আসতে পারেনি, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। তাই অন্যভাবে পর্যটকদের কোচবিহারমুখী করতে পর্যটন দপ্তরের পাশাপাশি এবার আগ্রহী হয়েছে রাজ্যের বন দপ্তর। সেই কারণেই এই জেলায় তিনটি ডিয়ার পার্ক তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছে তারা।

ডুয়ার্সের জঙ্গলে কেবলমাত্র সাফারি করতে গেলেই নানান বন্য প্রাণীর দেখা মেলে। সেই সঙ্গে দেখা পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রজাতির হরিণের। মাঝেমধ্যেই জঙ্গল থেকে হাতি, বাঘ, গন্ডার লোকালয়ে চলে এলেও, শান্তশিষ্ট নির্বিরোধী হরিণের লোকালয়ে আসার তেমন কোনও খবর সাধারণত পাওয়া যায় না। কিন্তু এবার সেই লোকালয়েই ডিয়ার পার্ক তৈরি করতে উদ্যোগ নিচ্ছে বন দপ্তর, যার সূচনা করা হবে কোচবিহার জেলা দিয়ে। এর ফলে জঙ্গল সাফারি না করেও অনায়াসেই দেখা মিলবে হরিণের। জানা গিয়েছে, কোচবিহারের শালবাগান, দিনহাটার গোসানিমারির শালবাগান এবং মাথাভাঙার তেকুনিয়া পার্ক সংলগ্ন জঙ্গলকে ডিয়ার পার্ক হিসেবে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। এর ফলে এসব জায়গার প্রতি সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পর্যটকরাও আগ্রহী হবেন বলে আশা করছেন রাজ্য বনাধিকারিকরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, লোকালয়ের মধ্যে জঙ্গলকে ঘিরে এ ধরনের প্যাচ ফরেস্ট তৈরি করা হবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ইতিমধ্যেই কোচবিহারের ডিএফও-কে প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করে জমা দিতে বলা হয়েছে বলে জানালেন বন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন। এসব করতে যা টাকা লাগবে তা কোথা থেকে আসবে, সে কথাও নাকি আধিকারিককে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। জঙ্গলের চারদিকে ফেন্সিং করে, সেখানে হরিণ ছাড়ার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে যে খরচ হবে, তার ডিটেল্‌ড প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করার কাজ চলছে বলে জানা গেল কোচবিহারের ডিএফও বিমান বিশ্বাসের কাছে। তবে তাঁর মতে, সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। গোটা ব্যাপারটা হতে এখনও কিছুটা সময় লাগবে।

এর আগে বাম-আমলে বাণেশ্বরের খোল্টা পার্ক ও ফালাকাটার কুঞ্জনগরে হরিণ রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে সেসব হরিণকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কারণ হিসাবে দেখানো হয়, সেখানে ছোট ছোট খাঁচার মধ্যে রাখার ফলে তাদের স্বাভাবিক আচার-আচরণ ও বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সেন্ট্রাল জু অথরিটির নিয়ম অনুসারেও এটা বেআইনি। ফলে রাতারাতি সে জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলা হয় হরিণ। আর পার্কগুলোর অবস্থাও বেহাল হয়ে পড়ে। তবে আবার নতুন করে ডিয়ার পার্কের উদ্যোগ কেন? বন মন্ত্রী জানান, যে তিনটি জায়গায় ডিয়ার পার্কের কথা ভাবা হয়েছে, তার প্রত্যেকটির আয়তন বেশ বড়। সেখানে হরিণ ছাড়লে তারা প্রায় নিজস্ব পরিবেশে মুক্তভাবে ঘোরাফেরা করতে পারবে। এদের মধ্যে সব চাইতে আয়তন বেশি কোচবিহার শালবাগানের। সে ক্ষেত্রে জঙ্গলের আয়তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেই অনুপাতে হরিণ ছাড়ার কথা ভাবা হয়েছে। পরবর্তীতে তাদের বংশবৃদ্ধি হলে আবার কিছু হরিণকে সেখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

মাথাভাঙা তেকুনিয়াতে বন দপ্তরের নিজস্ব একটা পার্ক রয়েছে। সেখানে প্রবেশ করার জন্য টিকিটেরও ব্যবস্থা আছে। শীতকালে পিকনিকের জন্য আজকাল প্রচুর মানুষ সেখানে আসে। পার্ক সংলগ্ন জঙ্গলেই ফেন্সিং করে হরিণ ছাড়া হলে সেটা অবশ্যই সাধারণের কাছে একটা বাড়তি আকর্ষণ হবে বলে অনেকের দাবি। এ ছাড়াও গোসানিমারির শালবাগানে এ ধরনের উদ্যোগ নিলে সেই অঞ্চলের উন্নতি হবে বলে স্থানীয় লোকেদের ধারণা। কিছুদিন আগে এই শালবাগান থেকেই গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ

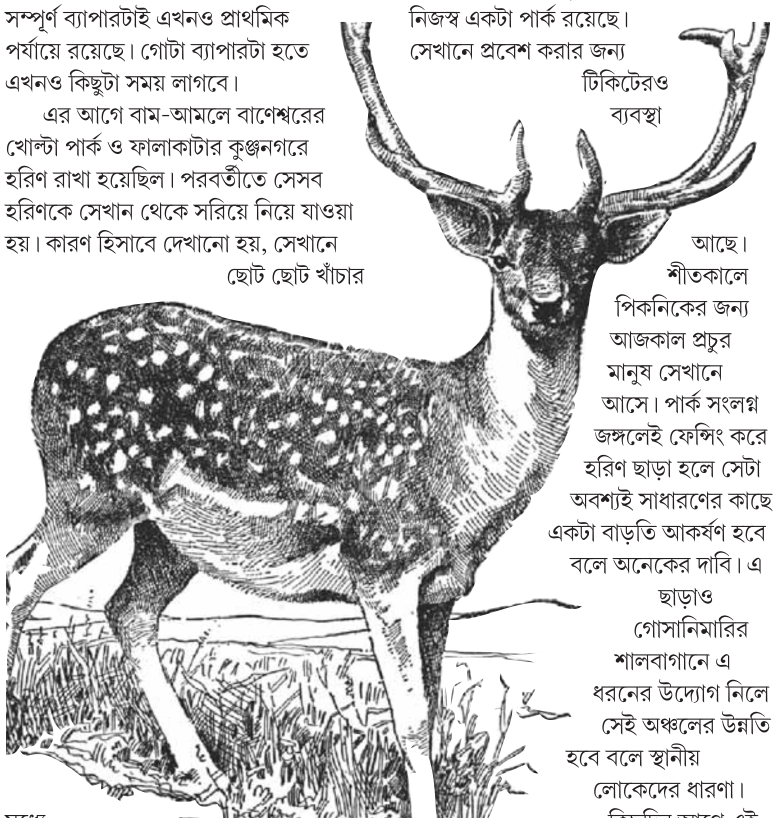

বন মন্ত্রী জানান, যে তিনটি জায়গায় ডিয়ার পার্কের কথা ভাবা হয়েছে, তার প্রত্যেকটির আয়তন বেশ বড়। সেখানে হরিণ ছাড়লে তারা প্রায় নিজস্ব পরিবেশে মুক্তভাবে ঘোরাফেরা করতে পারবে। এদের মধ্যে সব চাইতে আয়তন বেশি কোচবিহার শালবাগানের। সে ক্ষেত্রে জঙ্গলের আয়তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেই অনুপাতে হরিণ ছাড়ার কথা ভাবা হয়েছে

উঠেছিল। অভিযোগ ছিল সেখানে চলা অসামাজিক কাজকর্মেরও। ডিয়ার পার্ক হলে সেই জায়গার কিছুটা পরিবর্তন হবে। গোসানিমারি মন্দির, রাজপাট ঘুরতে আসা পর্যটকরাও বাড়তি আকর্ষণ পাবেন বলে আশা স্থানীয় বাসিন্দাদের। বছর দেড়েক আগে বন বিভাগের পক্ষ থেকে কোচবিহারের শালবাগানটির সৌন্দার্যায়ন করা হয়। অথচ এই শালবাগান নিয়েও বিস্তর অভিযোগ। কিছুদিন আগেই সেখানে একটি খুনের ঘটনা নিয়ে শোরগোল পড়েছিল। পিকনিকের সময় প্রচুর পিকনিক পার্টি এখানে আসে আনন্দ করতে। ডিয়ার পার্ক হলে এই শালবাগানও একটা বাড়তি মাত্রা পাবে।

তবে শুধু হরিণেই শেষ নয়, জানা যাচ্ছে, কোচবিহারে আসতে চলেছে গন্ডারও। পাতলাখাওয়ার জঙ্গলে গন্ডার আনার জন্য এ মাসেই স্টেট ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ড-এর মিটিং-এ প্রস্তাব দেওয়া হবে। ডুয়ার্সের জঙ্গলে গন্ডারের আধিক্য এমনিতেই বনকর্মীদের মাথাব্যথার কারণ। তারা মাঝেমধ্যেই জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে চলে আসছে। সে ক্ষেত্রে পাতলাখাওয়া ও রামসাইয়ের জঙ্গলে তাদের কয়েকজনকে স্থানান্তরিত করতে চাইলে কেন্দ্রের অনুমোদন পেতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না বলে আশা করছেন বন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন। হরিণ গন্ডার মিলে চেষ্টা করলে এবার হয়ত বনমন্ত্রীর বনহীন জেলাতেও পর্যটক আগমন বাড়বে এই বিশ্বাস বনকর্তাদের আছে তা বোঝাই যাচ্ছে। মন্ত্রী সাহেবের যে তাঁদের উপর অগাধ আস্থা!

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

নেড়িদের আশ্রম! অরিন্দম!! আশ্চর্যম্!!!

'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' মহাপুরুষের এই বাণী বর্তমান সময়ে কতটা প্রযোজ্য! ক'জন মানুষই বা আছেন, যাঁরা জীবের সেবাকে পরমধর্ম বলে মান্যতা দিতে পারেন? সবাই এখন ভোগবাদের পিছনে ছুটে চলেছে। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতেই সবাই এখন ব্যস্ত। তবুও এরই মাঝে এমন কিছু মানুষ আজও আমাদের সমাজে আছেন, যাঁরা স্বার্থ, ভোগ ইত্যাদিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে ব্যতিক্রমের নজির গড়ে তোলেন। এমনই একজন মানুষ হলেন জলপাইগুড়ি শহরের পান্ডাপাড়ার শরৎপল্লি এলাকার বাসিন্দা অরিন্দম বিশ্বাস। জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তরের অধীনে কর্মরত অস্থায়ী গাড়িচালক এই অরিন্দমের জগৎ বলতে জ্যাকি, রকি, পুচু, রানি, পুগি, ভুলু, জিনিয়া, রুপো, চার্লি, প্রিন্সদের সঙ্গ। এদের পরিচয়, এরা সকলেই পথকুকুর এবং বিড়াল। এদের প্রত্যেকের ঠিকানা শরৎপল্লি এলাকায় অরিন্দম বিশ্বাসের বাড়ি। সমাজের অবহেলিত পথকুকুর ও বিড়ালদের নিয়েই অরিন্দমের সুখের সংসার। চারপেয়ে এই পোষ্যগুলি অরিন্দম ও তাঁর সহধর্মিণী সংযুক্তার সন্তানসম আদরণীয় সঙ্গী। অরিন্দমের বাবা ডুয়ার্সের দলসিংপাড়া চা-বাগানে কাজ করতেন। সেখানেই জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে অরিন্দমের। ছোট থেকেই অরিন্দম পশুপ্রেমী। তাঁর খেলার সঙ্গীও থাকত এই কুকুর-বেড়ালের দলই। অরিন্দমের মা-ও ছিলেন একজন পশুপ্রেমী। যে কোনও পশুপাখির অসুস্থ ও আহত হওয়ার খবর পেলেই তিনি তাদের অত্যন্ত যত্ন সহকারে চিকিৎসা করতেন। মায়ের এই পশুপাখির সেবা দেখেই আরও বেশি উজ্জীবিত হন অরিন্দম। গত ১২ বছর ধরে জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা অরিন্দম এবং তাঁর স্ত্রী। স্বামীর এমন পশুপ্রেম দেখে স্ত্রী সংযুক্তাও নিজেকে জ্যাকি-রকি-পুচুদের থেকে এক মুহূর্তও দূরে রাখতে পারেন না। অরিন্দম সকালে গাড়ি চালাতে চলে গেলেই সংযুক্তা কুকুর-বিড়ালদের খাবার তৈরি ও তাদের পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সময়মতো তিন বেলা খাবার পরিবেশনের মতো নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষাও চলে পোষ্যদের। অরিন্দম জানান, তিনি কখনওই পথের অবলা পশুদের অবহেলা সহ্য করতে পারেন না। তাই কোথাও কোনও কুকুর-বিড়ালকে অবহেলায় পড়ে থাকতে দেখলেই তৎক্ষণাৎ তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। তাদের জন্য বাড়ির সিংহভাগ অংশই বরাদ্দ করে রেখেছেন অরিন্দম।

আগে ২৮টি পথকুকুরকে লালন করতেন তিনি। এর পর কিছু কুকুর অসুখে মারা যায়, আর কিছু কুকুরকে অন্য পরিবারে দান করে দেন। অরিন্দম অস্থায়ী গাড়িচালক হওয়ায় তাঁর মাসিক আয় অনেক কম। তবুও সেই স্বল্প আয়ের বেশির ভাগই বরাদ্দ কুকুর-বিড়ালদের জন্য।

অরিন্দমের এই পোষ্য সন্তানদের কথা অনেকেই জানেন। অনেকে তাঁকে সহায়তাও করেন। নিঃস্বার্থভাবে। শহরের একটি ওষুধের দোকানের মালিক বুবাই সরকার যেমন এই কুকুর-বিড়ালদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ওষুধপত্র দিয়ে থাকেন, তেমনই

অরিন্দম সঙ্গে তার পোষ্যরা

মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের এক মাংসবিক্রেতা সর্বণ অত্যন্ত কম খরচে মুরগির দেহাংশ দিয়ে থাকেন কুকুরদের জন্য। অরিন্দম জানান, তিনি অত্যন্ত দরিদ্রতার মধ্যে জীবনযাপন করলেও কখনওই কারও কাছে এক টাকাও ধার নেন না। তিনি তাঁর বাড়িতে এইসব পথকুকুর ও বিড়ালের জন্য গড়ে তুলেছেন ‘বেঙ্গল হেভেন ডগ অ্যান্ড ক্যাট রেসকিউ অ্যান্ড অ্যাডপশন সেন্টার’। অরিন্দমের এখন মূল লক্ষ্য শহরের বাইরে গজলডোবা এলাকায় একটি বড় মাপের ডগ রেসকিউ ও অ্যাডপশন সেন্টার খোলা। এর জন্য জমির খোঁজ চালাচ্ছেন তিনি। বড় মাপের এই কেন্দ্র খোলার জন্য তিনি প্রশাসন ও সরকারি সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন।

‘জন্মিয়াছ যখন, তখন একটা দাগ রাখিয়া যাও।’ স্বামীজির এই বাণীকে স্মরণ করে অরিন্দম বলেন, তাঁর এই জন্মকে পশুপাখিদের সেবার মধ্যে দিয়েই সার্থক করে তুলতে চান। জীবে প্রেম করেই কাটিয়ে দিতে চান বাকি জীবন।

শুভ্রজিৎ পোদ্দার

ফলাহারী ল্যাজ নাড়ে ডাকে ঘেউঘেউ

মাছ-মাংস দিলে সে বিরক্ত হয়। কিন্তু মনিব যদি সামনে ফল মেলে ধরে তবে সে আনন্দে গোঁ গোঁ করতে থাকে। সারাদিনে আপেল, আঙুর, কলা, শসা, বেদনা, আম খেয়েই তার সময় কেটে যায়। ফলাহারি কুকুর মেহবুব এতটাই অহিংস যে কাওকে সে কামড়ে দেওয়ার জন্য ছুটে যায় না। কারও গায়ে অসভ্যর মতো হামলে পড়ে না। মেহবুব মানে প্রেমিক। তার মধ্যে হিংসা নেই, কাউকে কামড় বা আচর দেয় না বলে নাম মেহবুব।

শিলিগুড়ি ঘোঘোমালির বাসু দত্তের বাড়িতে আট মাসের কুকুর মেহবুবকে ঘিরে বাড়ির লোকজনই নয়, অন্যদের মধ্যেও চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন তার খাবারের তালিকায় মাছ-মাংস নয়, ভাতও নয়, থাকছে আপেল, আঙুর, আম, তরমুজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ফল। বিভিন্ন সবজি সেদ্ধ করে দিলেও সে খেয়ে নিচ্ছে। মনিব যদি বলে, আঙুর খাবি? সে ভউ ভউ করে নাচতে থাকে। পাগ প্রজাতির এই কুকুরটিকে চল্লিশ দিন বয়সে কলকাতা থেকে ১৮ হাজার টাকায় কিনে নিয়ে আসেন তার মনিব। এরপর থেকে তিনি লক্ষ্য করেন কুকুরের মধ্যে আজব অভ্যাস। বাসুবাবু বলেন, রুটি দিলেও ও খায় না। দুধভাত দিলে দুধ খায়, ভাত খায় না। আর মাছ-মাংসে ওর ঘোর আপত্তি। তবে ফল দেখলেই ও রীতিমতো লাফাতে থাকে। সারাদিনে ৪০০ গ্রাম ফল ওর মেনুতে থাকে। শিলিগুড়িতে কুকুর নিয়ে বহুদিন ধরে কাজ করা শ্যামা চৌধুরী ও পায়েল সরকার বলেন, এটি একটি বিরল ব্যাপার। পশু চিকিৎসক ডাক্তার ডি পি পান্ডে বলেন, কুকুর মাছ-মাংস ভালবাসে, তবে মাছ-মাংস ছেড়ে কোনও কুকুর যে ফল খায় তা তিনি প্রথম দেখলেন। মেহবুবকে এখনও কোনও অসুস্থতার জন্য ডাক্তার দেখাতে হয়নি তার মনিবকে। তবে তাকে বেশ কিছু দিন আগে টিকা দিতে আসেন পশু হাসপাতালের কর্মী সিতেশ সরকার। তিনিও জানালেন, এই ঘটনা বিরল তো বটেই।

নিজস্ব প্রতিনিধি

বক্সাবনের নকশা বদল

শেয়ালমামা হুক্কাজমায়
ভাগ ভাগনে ভাগ!
বক্সাবনে আসছে শুনি
আধা ডজন বাঘ!!

হালুম হালুম তাদের নাকি
বড্ড ভীষণ রাগ!
রোজ লাঞ্চে চাই-ই চাই
কচি মাটন-শাগ!!

ম্যা ম্যা সুরে কান্না জুড়ে
হাজার শিশু ছাগ!
রাম জ্যাঠা চুলকে দাড়ি,
রাত্তিরে সব জাগ!!

ফোকলা ভালু
একলা বকে
দেখতে পেলেই
‘পাগ’!
আলতো দুলে বগল
তুলে
বন্দুকটা তাগ!!

পাগলা হনু ডিগবাজি খায়
লাগ ভেলকি লাগ!
মোরগ বুড়ো কোঁকায়, ওরে
আসুক আবার মাঘ!!

সনাতন চন্দ

পাঠকের পরিক্রমা

রোজকার রুটিনের বাইরে মাঝে মধ্যে বেরিয়ে পড়লে মন ভাল থাকে, স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি ঘটে। সব সময়ে যে টুরিস্ট স্পটেই যেতে হবে তা না একটু দূরে কোথাও বাসে গাড়িতে কোনও গ্রামে বা কোনও নদীর ধারে কিংবা কোনও পার্কে বা কোনও গ্রামীণ হাটে— যেখানেই হোক না ছবি তুলুন আর ফিরে এসে সেই সব ছবির সঙ্গে দুকলম লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের। আমরা ছাপব আপনার বেড়ানোর ছবি-গল্প।

কিঙ্কিনির বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

জলপাইগুড়ি পৌরসভার প্রয়াস মঞ্চে গত ৭ জুন অনুষ্ঠিত হল এই শহরের নামী নৃত্যশিল্পী শর্মিষ্ঠা মুন্সি পরিচালিত কিঙ্কিনির বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রদীপ জ্বালিয়ে সন্ধ্যাকালীন এই অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন শহরের বরিষ্ঠ ধ্রুপদী সংগীতশিল্পী ও কবি শেখর কর। কানায় কানায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে শিশুশিল্পী নন্দিনী ব্যানার্জির রবীন্দ্রনৃত্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। এর পর অদৃতা মিত্র, চিত্রলেখা চক্রবর্তী, অনিন্দিতা রায়, অস্মিতা সরকার প্রমুখ বিভিন্ন আঙ্গিকের নৃত্য প্রদর্শন করেন। দেবার্পিতা মজুমদার, রাইমা ভৌমিক ও গরিমা সেনের পঞ্চম সওয়ারি তালের উপর কথক নৃত্য দর্শকদের আপ্লুত করে তোলে। তারপর লোকনৃত্য পরিবেশন করে মুগ্ধ করেন স্নেহা চৌধুরী, শ্বেতা চক্রবর্তী, শ্রেয়া রায়, অনন্যা বসাক। পাশাপাশি সায়ন্তনী দাশগুপ্ত, সুজাতা রায়ের নজরুলগীতি ও লোকগীতি শ্রোতাদের আবিষ্ট করে রাখে। এ ছাড়াও দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন সোমদত্তা পাত্র, ঐশিকা, নিদর্শনা, অন্বেষা রায়, দ্বিজা রায়। অনুষ্ঠানের শেষ দিকে মঞ্চে ওঠে শিলিগুড়ির 'ঋ' ব্যান্ড। লিড সিঙ্গার সুজিত মুখার্জির গানে উদ্‌বেল হয়ে ওঠেন দর্শক-শ্রোতা। রিদ্‌ম গিটারে মোহিত করে রাখেন কৌশিক কুণ্ডু। বেস গিটারে বিশ্বজিৎ কর, লিড গিটারে তাপস পাল, কাহনে সৌরভ রায় তুমুল হাততালি অর্জন করেন।

কিঙ্কিনির পরিচালিকা শর্মিষ্ঠা মুন্সি জানান, গত কুড়ি বছর ধরে জলপাইগুড়ি শহরে তাঁর দলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। প্রতি বছর ৭ জুন এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তাঁর পিতা কমলাচরণ ভট্টাচার্যর পুণ্য স্মৃতিতে। তাঁর স্বামী প্রদীপ মুন্সি ডুয়ার্সের একজন প্রসিদ্ধ তবলাবাদক। শর্মিষ্ঠার মতে, প্রদীপবাবুর সাহচর্য ছাড়া এত বড় অনুষ্ঠান পরিচালনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না।

নিজস্ব প্রতিনিধি

আনন্দম-এর নাট্য কর্মশালা

প্রতি বছরের মতো এ বছরও আনন্দম কালচারাল সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল শিশু-কিশোর নাট্য কর্মশালার। ১ থেকে ৭ জুন কোচবিহারের উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে আয়োজিত এই কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ৩০ জন শিশু-কিশোর অংশগ্রহণ করেছে বলে সংস্থার পক্ষ থেকে জানান সুকন্যা দত্তগুপ্ত। মাঝে একদিন স্থানীয় এনএন পার্কে প্রকৃতির মাঝেও কর্মশালা হয়। কর্মশালার শেষ দিনে পরিবেশিত হয় বাচ্চাদের তৈরি করা একটি

নাটক। আনন্দম-এর প্রতিষ্ঠাতা শংকর দত্তগুপ্তর অকালমৃত্যু এই কর্মশালার আয়োজনে বাধা হয়নি। তাঁর পুত্র-কন্যা এই সংস্থাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। দৌড় শেষ হয়নি, কেবল ব্যাটনের হাতবদল হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

নটনিক্কণ-এর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

কোচবিহার নটনিক্কণ ডান্স অ্যাকাডেমির পরিচালনায় ২১ মে স্থানীয় রবীন্দ্রভবন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রনৃত্যের প্রতিযোগিতার পাশাপাশি নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জমজমাট ছিল এ দিনের সন্ধ্যা। রুমা চক্রবর্তীর সংগীত ও পিয়াল চক্রবর্তীর গিটারবাদন প্রশংসিত হয়। পূর্বাচল দাশগুপ্ত পরিচালিত নাটক 'জীবন্ত স্ট্যাচু' পরিবেশন করে কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপ। তারা নটনিক্কণ-এর বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজনেও সহযোগিতা করেছিল। এই সন্ধ্যার অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'নতুনত্বে চিত্রাঙ্গদা'। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যকে নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করেন এমিলি দাস। তাঁর কোরিয়োগ্রাফি অনুষ্ঠানে অন্য মাত্রা এনে দেয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ছন্দা দাস, দীপঙ্কর দাস, সুরঞ্জিত ধর এবং মল্লিকা বিশ্বাস। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বজিৎ সাহা, পঙ্কজ ঘোষ, শুচিস্মিতা দত্ত শর্মা এবং বিজন সাহা।

নিজস্ব প্রতিনিধি

আলিপুরদুয়ারে নানা উদ্‌যাপন

বিশ্ব তামাক দিবসে

বিশ্ব তামাক দিবস উপলক্ষে আলিপুরদুয়ার শহরের একটি বেসরকারি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিনামূল্যে ক্যানসার চিকিৎসা শিবির ও ক্যানসার-সচেতনতা নিয়ে আলোচনাসভা। আলিপুরদুয়ার পুরসভার উদ্যোগে ও গীতাঞ্জলির সহযোগিতায় এই চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আলিপুরদুয়ার পুরসভার পুরপ্রধান আশিস দত্ত এই শিবিরের উদ্‌বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডাঃ মণীশ গোস্বামী, মৃদুল গোস্বামী। গীতাঞ্জলির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জি, ডাঃ হিমাদ্রি মণ্ডল-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে সংগীতশিল্পী জয়ন্ত ব্যানার্জির অসাধারণ গজল ও কঙ্ক মুখার্জির মঞ্চ সঞ্চালনা সবাইকে মুগ্ধ করে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে

আলিপুরদুয়ার বিবেকানন্দ ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ জিৎপুরের বাদলনগরে অনুষ্ঠিত হল বিশ্ব পরিবেশ দিবস। সকাল ৮টায় প্রভাতফেরির মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এবং সারাদিন বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করা হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম কর্মকর্তা প্রসেনজিৎ দাস জানান, সারা বছর ধরেই তাঁরা বৃক্ষরোপণ, রক্তদান ও পরিবেশসচেতনতার মধ্যে দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিশিষ্টজনরা।

সোহিনি বার্ষিকি

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার শহরের ম্যাকউইলিয়াম ইনস্টিটিউট (মায়া টকিজ) প্রেক্ষাগৃহে হয়ে গেল শহরের অন্যতম সংগীত ও নৃত্য বিদ্যালয় সোহিনি সংগীত বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সদ্যপ্রয়াত সংগীতশিল্পী শুক্লা রায় সরকার নামাঙ্কিত স্মৃতি মঞ্চের উদ্‌বোধনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশিষ্ট সংগীতশিক্ষক অনুমাধব সরকার। উপস্থিত ছিলেন নৃত্যশিল্পী দেবজয়া সরকার, তবলাবাদক সুজিত সরকার, সৃজন রায় ও নাট্যকর্মী পরিতোষ সাহা। এঁদের সবাইকে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্মাননা জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা কল্পনা আইচ। প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী একে একে সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। নেহা দাস, দিয়া রায়, রিমি রায়, ঈশিতা রায়, মনীষা দাস, পরমা ঘোষ, সোহিনি মণ্ডল, জুঁই দাস, হিয়া পাল, অরুণিমা সাহা, রিমা দত্ত, আয়ুষী সাহা, মুসকান খাতুন, কৃত্তিকা রায়, মানবী রায়, সৃজা রায়, অদ্বিতীয়া সাহা, স্নায়বী দে, রাই ভৌমিক, অঙ্কিতা বর্মন, অর্পিতা কুণ্ডু, পৌলোমী অধিকারী, প্রিয়াঙ্কা সাহা, প্রিয়া মণ্ডল, সৃজা লস্কর, দেবস্মিতা ভৌমিক, তনুশ্রী লস্কর, শর্বরী রায়, প্রিয়াঙ্কা কুণ্ডু— এঁদের সংগীত ও নৃত্য উপস্থাপনা দর্শকরা অনেকদিন মনে রাখবেন। বিদ্যালয়ের পক্ষে শিক্ষিকা কল্পনা আইচ জানালেন, আলিপুরদুয়ারে প্রেক্ষাগৃহের বড়ই অভাব। অবিলম্বে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রেক্ষাগৃহ হওয়া দরকার।

নজরুল জয়ন্তী

আলিপুরদুয়ার শহরে প্রতি বছরের মতো এ বছরও সাড়ম্বরে প্রকৃতির কোলে অনুষ্ঠিত হল নজরুলজয়ন্তী। সকাল ৮টায় আলিপুরদুয়ার চৌপথি থেকে বর্ণময় প্রভাতফেরির মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ। প্রভাতফেরি শেষ হয় প্রভাত সংঘর সামনে নজরুলমূর্তির পাদদেশে। তারপর নজরুলমূর্তিতে মাল্যদান করেন অধ্যাপক অর্ণব সেন মহাশয়। এ ছাড়া উপস্থিত সকলেই পুষ্পার্ঘ নিবেদনের মধ্যে দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। স্বপন ভৌমিক প্রারম্ভিক সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে গৌরবময় অতিথির আসন অলংকৃত করেন প্রমোদ নাথ, প্রদীপ দে, রণজিৎ মালাকার প্রমুখ। মনোমুগ্ধকর বক্তব্য রাখেন সসীমকুমার নন্দী, বিপ্লব মজুমদার। গানে দেবাশিস ভট্টাচার্য, ঊর্মি রায়, গ্লোরিয়া সূত্রধর, দেবলীনা বোস বিশেষ মাত্রার অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রসেনজিৎ দাস। অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা প্রসেনজিৎ দাস জানান, আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০-১৫০ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া প্রভাতফেরিতে প্রায় ৮০০ মানুষ পা মিলিয়েছেন, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তিনি আরও জানান, আগামী দিনে আরও বৃহৎভাবে বড় অংশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এই অনুষ্ঠান পালন করা হবে। আলিপুরদুয়ারে যে অসংখ্য সাহিত্য-সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের বসবাস, তার প্রমাণ মেলে এ ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই।

নিজস্ব প্রতিনিধি

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {18.9cm (W) X 27.07 cm (H)}, Non Bleed {15.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {15.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {7.5 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {4.8cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 15.5 cm (W) X 5.2 cm (H), 1/4 Page 7.5 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {4.8 cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2017 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

চিকিৎসা/প্রতিরোধ

দিনরাত এসি-তে কতটা ক্ষতি হচ্ছে আপনার সন্তানের?

গ্লোবাল ওয়ার্মিং। এই দু'টি ইংরেজি শব্দ এখন আমাদের নগরজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। কারণ এর উপস্থিতি আমরা টের পাই হাড়ে হাড়ে। আমাদের সবার চিরমনোরম ডুয়ার্সও এখন এর করাল থাবা থেকে মুক্তি পায় না। গ্রীষ্মের আঁচে দক্ষিণবঙ্গের মতোই দিশেহারা জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার-কোচবিহারের মানুষ। বেশ কয়েক বছর ধরেই গ্রীষ্মের ছুটিতে শীতলতার খোঁজ মেলে না খোদ কালিম্পঙেও। এসি গাড়ি আর এসি ঘর ছাড়া নাগরিক জীবন এ সময় দুঃসহ। শপিং মল, শোরুম, অফিস, রেস্তরাঁ, সিনেমা হল, হাসপাতাল, এমনকি স্কুলের ক্লাসরুম বা টিউশন ক্লাসেও এসি ছাড়া ভাবতে পারছি না আমরা। এসি-র দুটো দিক আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট। এক, এসি মানেই আপসহীন কমফর্ট। আর দুই, এসি মানেই এক্সট্রা খরচের বোঝা। কিন্তু দিনরাত এসি-তে কাটাবার ভয়ংকর কুপ্রভাব সম্পর্কে কতটা জানি আমরা? আমাদের নিজেদের কথা না হয় বাদই দিলাম, আমাদের প্রিয় সন্তানদের এসি-র আরাম দিতে গিয়ে কতটা ক্ষতি করছি তা নিয়ে কি কেউ ভাবি আমরা?

১) যত এসি-তে থাকা যায়, ততই বাইরের প্রাকৃতিক তাপ সহ্য করার ক্ষমতা কমে যায়। অর্থাৎ শরীরের প্রতিরোধক ক্ষমতাও কমতে থাকে। এসি-র ভিতরে-বাইরে ঘন ঘন যাতায়াত থাকলে সর্দিকাশি, জ্বরজারি লেগেই থাকে।

২) দীর্ঘক্ষণ এসি-তে থাকা মানেই শরীরের ভিতরে তাপমাত্রার পরিমাণ কমে যায়। তার ফলে শরীর জুড়ে দ্রুত নামে অতিরিক্ত অবসাদ ও ক্লান্তি।

৩) ডাক্তারদের কথায়, যারা দিনে চার ঘণ্টার বেশি এসি-তে থাকে, তাদের সাইনাসাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকগুণ বেড়ে যায়। একবার ধরলে যা বারবার ফিরে আসে।

> আমাদের নিজেদের কথা না হয় বাদই দিলাম, আমাদের প্রিয় সন্তানদের এসি-র আরাম দিতে গিয়ে কতটা ক্ষতি করছি তা নিয়ে কি কেউ ভাবি আমরা?

৪) এসি-তে ক্ষতি হয় চোখের। কারণ এসি-তে শুকিয়ে যায় চোখের স্বাভাবিক তরল গ্রন্থিও। যার ফল হতে পারে চোখ ফুলে যাওয়া, চুলকানো, লাল হওয়া ইত্যাদি। এসব ক্রমাগত হতে থাকলে চোখের কঠিন সমস্যা।

৫) এসি-তে তাজা বাতাস বাইরে থেকে ঢোকে না, একই বাতাস ঘুরে-ফিরে আসতে থাকে, যার ফলে ভাইরাস সংক্রমণের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। হাসপাতালেও দেখা যায় এক রোগের চিকিৎসা বা অপারেশন করাতে এসে রোগীকে অন্য ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের স্বীকার হতে।

৬) যেখানে এসি মেশিন নিয়মিত পরিষ্কার হয় না, সেখানে জমতে থাকে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক, যেগুলো বাতাসের সঙ্গে মিশে ঢুকে পড়ে ফুসফুসে। আজকাল শহরে অল্পবয়সিদের ব্রিদিং ট্রাব্‌ল বা শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা প্রায়শই দেখা যায়। নিউমোনিয়ার মতো ভয়ংকর সংক্রমণ হতে পারে এসি থেকেই।

৭) ক্রমাগত এসি-র ব্যবহার ত্বককে শুকিয়ে দেয়। ত্বকের ঔজ্জ্বল্য কমতে থাকে। দেখা যায় নানা ধরনের ত্বকের সংক্রমণ।

৮) আমাদের দেশে বেশির ভাগ জায়গাতেই এসি-র নিয়মিত পরিষ্কার, সার্ভিসিং হয় না, যার অন্যতম কুফল নানা ধরনের অ্যালার্জি। ডাক্তারের চেম্বারে অ্যালার্জি পেশেন্টের সংখ্যা তাই ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

আপনার শহর এলাকা থেকে খানিক দূরে গ্রামের যে ছেলেমেয়েরা এই গরমে সাইকেলে চেপে ইস্কুলে যায়, ক্লাসরুমে কুলকুল করে ঘামতে থাকে, দুপুরে মাঠে বসে সবার সঙ্গে মিডডে মিল খায়, আর বিকেলে বাড়ির আশপাশে হুড়োহুড়ি করে কাটায়, তাদের এইসব রোগ ছুঁতে পারে না। আপনি আপনার সন্তানকে সেই পরিবেশ দিতে পারবেন না। এসি-কে আপনি চাইলেও না করতে পারবেন না। কিন্তু সন্তানের ভবিষ্যৎ বাঁচাতে আপনি যেটা করতে পারেন, সেটা হল— এসি-র বাইরে যতটা সম্ভব গা ঘামানো, খোলা হাওয়ায় যতটা পারা যায় শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া। শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে কমতে তলানিতে ঠেকার আগেই জেগে উঠুন। হাত বাড়িয়ে রিমোট সুইচটা অফ করতে শিখুন।

মৃন্ময়ী মহাপাত্র

রূপসী ডুয়ার্স

মেচেতার সমস্যা দূর করবেন কী করে?

টিপস্ দিচ্ছেন প্রখ্যাত বিউটিশিয়ান **মালা দাস**

বর্তমান যুগে সকলেই নিজের জীবনে ব্যস্ত, কারও কাছেই কোনও সময় নেই। সকলেই যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে। জীবনও যন্ত্র ছাড়া চলে না। ব্যস্ত জীবনের নানা সমস্যার মধ্যে ত্বকের ও নানা ধরনের সমস্যা, যেমন— পিগমেন্টেশন, ট্যান, ফ্রিকিলস্, অসময়ের বলিরেখা, মেলাসমা ইত্যাদি। মেলাসমাকে বাংলায় মেচেতা বলা হয়।

মেচেতা নিয়ে আলোচনা করব। এটা নানা ধরনের হয় এবং নানা কারণে হয়ে থাকে। যখন প্রথম দেখা দেয়, তখন কেউ ততটা নজর দেন না। যদি বা নজর দিলেন, তখন নিজে নিজেই নানারকম ক্রিম কিনে লাগান এবং ঘরোয়া কিছু করে থাকেন। এর ফলে এটা বেড়ে যায়। এটা যত পুরনো হয়, তত সারতে সময় লাগে। অনেক কারণেই মেলাসমা/মেচেতা দেখা দেয়— থাইরয়েড, অ্যানিমিক, হরমোনের ভারসাম্যের অভাব, খুব বেশি রোদের সংস্পর্শে আসা, মদ্যপান, ভুল ওষুধের ব্যবহার, জন্মগত, গর্ভনিরোধক পিল খাওয়া, বেশি মেকআপ ব্যবহার করে ঠিকমতো পরিষ্কার না করা। মেকআপ কিট সবসময় ভাল কোম্পানির ব্যবহার করবেন। এইসব নানা কারণে মেচেতা হয়।

গর্ভবতী থাকার সময় অনেকের বাটারফ্লাই শেপ দেখা দেয়, তখন একটু যত্ন করলেই চলে যায়। কখনও ডেলিভারির পর নিজে থেকেই চলে যায়। মেচেতা হওয়ার কারণ, যে কোনও কারণে আমাদের ত্বকে যে মেলানোসাইট সেল থাকে, সেটা মেলানিন তৈরি করা বন্ধ করে দেয়। এটা হলে অবহেলা করবেন না। রাত জাগবেন না।

মোবাইল এবং কম্পিউটারে ব্যস্ত থাকাটাও একটু কমাতে হবে— অবশ্য অনেক সময় উপায় থাকে না। এর রেডিয়েশন থেকেও ত্বকে ছুলি ও পিগমেন্টেশন হয়ে থাকে। সকলে নিয়মিত ক্লিনজিং, টোনিং, ময়শ্চারাইজার এবং সানস্ক্রিন অতি অবশ্যই ব্যবহার করবেন। নিজেরা কিছু না কিনে বিশেষজ্ঞর কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে প্রোডাক্ট ব্যবহার করবেন। এ ছাড়া খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর রাখবেন। জল, ফল, সবজি বেশি খাবেন। সানগ্লাস ব্যবহার করুন, ছাতা নিতে পারলে ভাল। নিজের যত্ন নিন, ভাল থাকুন, আনন্দে থাকুন।

নিজের রূপ পরিচর্যা বিষয়ে প্রশ্ন পাঠান sahac43@gmail.com এই ইমেলে

AANGONAA
Ladies Beauty Clinic
Shahnaz Herbal • Aroma Therapy
Lotus Professional • Lotus Ultimo
Cheryl's Cosmeceuticals (Hair & Skin)
Loreal Professional
Schwarzkopf Professional
7 Bagha Jatin Road, Siliguri 734001
Satyajit Sarani, Shivmandir
Call : 9434176725, 9434034333

EKHON DUARS, Vol-4, Issue-6 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-১০। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।

কাহিনি : বৈকুণ্ঠ মল্লিক, ছবি : দেবরাজ কর

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.